খুর্‌রম জাহ্‌ মুরাদ

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক

খুররম জাহ্ মুরাদ

অনুবাদ
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশনী

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল

এপ্রিল, ১৯৮৫
নভেম্বর, ১৯৮৯
এপ্রিল, ১৯৯১
জুলাই, ১৯৯৪
মে, ১৯৯৮
ডিসেম্বর, ১৯৯৯

পরিমার্জিত সংস্করণ
ডিসেম্বর, ২০০০

পুনর্মুদ্রণ
জুলাই, ২০০২
ডিসেম্বর, ২০০৩

মুদ্রণে
জিসী প্রিন্টার্স
৩৮/২-খ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১৫৭৮

বিনিময়
২৫ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম সর্বদাই মানব সমাজের পুনর্বিন্যাস করেছেন। তাঁরা মানব জাতিকে এক বুনিয়াদী আদর্শের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। এবং সে আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছে, তাদেরকে এক নতুন ঐক্যসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। যে মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন দল-গোত্র-খান্দানে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলো, ছিলো পরস্পরের রক্ত পিপাসু ও ইজ্জতের দুশমন—এ আহ্বানের ফলে তারা পরস্পর পরস্পরের ভাই এবং একে অপরের ইজ্জতের সংরক্ষক বনে গেল। এই ঐক্যের ফলে এক নতুন শক্তির উদ্বোধন হলো এবং এই আহ্বান দুনিয়ার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সৃষ্টি করলো ও শ্রেষ্ঠতম সংস্কৃতি রূপায়ণের নিয়ামকে পরিণত হলো। এই গূঢ় সত্যের দিকেই আল কুরআন ইংগিত করেছে তার নিজস্ব অনুপম ভংগীতে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا وَّكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا

"আল্লাহ্র সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের ঘোরতর দুশমন, তখন তিনিই তোমাদের হৃদয়কে জুড়ে দিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর ফলে ভাই-ভাই হয়ে গেলে। (নিঃসন্দেহে) তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের তীরে দাঁড়িয়ে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সেখান থেকে নাজাত দিলেন (এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন।)"

আলে ইমরান : ১০৩

আম্বিয়ায়ে কিরাম মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন এই বলে ঃ

واعتصموابحبل الله جميعاولاتفرقوا

"আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো (ঐক্যবদ্ধ হও) এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" আলে ইমরান : ১০৩

ইসলামের এই একতা শুধু কানুনী বাহ্যিক একতা নয়, বরং এ হচ্ছে হৃদয়ের একত্ব। ইসলাম শুধু কানুনী ঐক্যকেই ঐক্য মনে করে না, বরং এই বাহ্যিক ঐক্যের বুনিয়াদকে সে মানুষের হৃদয়ে স্থাপন কারতে চায়। এর প্রকৃত উৎস হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদের ঐক্য, আশা ও আকাঙক্ষার ঐক্য, সংকল্প ও হৃদয়াবেগের ঐক্য। সে বাইরে যেমন সবাইকে এক ঐক্যসূত্রে গেঁথে দেয়, তেমনি ভেতর দিক দিয়েও তাদেরকে এক 'উখুয়্যাত' বা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে জুড়ে দেয়। আর এটাই সত্যযে, এই উভয় লক্ষণ যখন পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, প্রকৃত ঐক্য ঠিক তখনই গড়ে ওঠে। কারণ কৃত্রিম ঐক্য কখনো স্থায়ী হয় না। ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয় কখনো যুক্ত হতে পারে না। মিথ্যা কখনো কোনো ঐক্য গড়ে তুলতে পারে না। স্বার্থপরতামূলক ঐক্য শুধু বিভেদ ও অনৈক্যের উৎস হয়ে থাকে। আর শুধু আইনগত বন্ধনও কোনো যথার্থ মিলন বা বন্ধুত্বের ভিত্তি রচনা করতে পারে না। এ কারণেই ইসলাম একতার ভিত্তিকে ঈমান, ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের ওপর স্থাপন করেছে। এই ভিত্তিভূমির ওপর গড়ে ওঠা সম্পর্ক এমনি সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিণত হয় যে, তার সাথে সংঘর্ষ লাগিয়ে বড়ো বড়ো তুফানও শুধু নিজের মস্তকই চূর্ণ করতে পারে, কিন্তু তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

উপরন্তু এই ভিত্তির ওপর যে সমাজ সংস্থা গঠিত হয়, সেখানে বিরোধ ও সংঘর্ষের বদলে সহযোগিতা ও পোষকতার ভাবধারা গড়ে ওঠে। সেখানে একজন অপরজনের সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে থাকে। সেখানে পড়ন্ত ব্যক্তিকে পড়ে যেতে দেয়া হয় না, বরং তার সাহায্যের জন্যে অসংখ্য হাত প্রসারিত হয়। সেখানে পিছে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে ফেলে যাওয়া হয় না, বরং তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে সামনে এগিয়ে নেয়া হয়। এ সমাজ ব্যক্তিকে তার সমস্যাদির মুকাবেলা করার যোগ্য করে তোলে এবং পতনশীল ব্যক্তিকে আঁকড়ে ধরে রাখার কাজ আঞ্জাম দেয়।

ইসলাম যে ভিত্তিগুলোর ওপর তার সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে সেগুলোকে খুব ভালোমতো অনুধাবন করা এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিজের শক্তি ও সামর্থকে নিয়োজিত করা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও প্রিয় ভাই খুররম জাহ্ মুরাদ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এ বুনিয়াদী প্রয়োজনটি পূর্ণ করার জন্যে এই পুস্তকটি রচনা করেছেন। এ দেশের যে ক'জন নগণ্যসংখ্যক যুবক পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে বিশেষ প্রচেষ্টা চালিছেন এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, খুররম সাহেব তাঁদের অন্যতম। বস্তুতঃ খোশবু থেকে যদি ফুলের পরিচয় পাওয়া যায় তবে তাঁর এ রচনাটিও তাঁর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগী উপলব্ধি করার পক্ষে সহায়ক হবে।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য বিষয়টির তিনটি দিক রয়েছে ঃ

এক ঃ এক সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনধারা গড়ে তোলা এবং একে স্থিতিশীল রাখার জন্যে ইসলাম ব্যক্তি-চরিত্রে কোন্ কোন্ মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখতে চায়।

দুই ঃ কি কি বস্তু এ ভিত্তিগুলোকে ধ্বংস ও দুর্বল করে দেয়, যাতে করে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা যায়।

তিন ঃ কি কি গুণাবলী এ ভিত্তিগুলোকে মজবুত এবং উন্নত করে তোলে, যাতে করে সেগুলোকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্রদ্ধেয় লেখক অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে এ তিনটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ যদি এই জবাবগুলো অভিনিবেশ সহকারে পড়েন এবং এগুলো অবলম্বন করার প্রয়াস পান, তবে নিজেদের সামগ্রিক জীবনকেই তারা ঈমান, ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের পুষ্পে—যা জীবনের ফুল-বাগিচাকে কুসুমিত করে তোলে—পুষ্পিত করতে পারবেন।

এ পুস্তিকা থেকে উপকারিতা লাভের ব্যাপারে কর্মীদের আরো একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সমস্ত জিনিস মানুষ রাতারাতি অর্জন করতে পারে না। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ঃ চরিত্র গঠনের গোটা পরিকল্পনাটিকে বুঝে নিয়ে এক একটি জিনিসকে মনের মধ্যে খুব ভাল মতো বদ্ধমূল করে নেয়া,

তারপর তাকে গ্রহণ ও অনুসরণ করার চেষ্টা করা এবং এভাবে প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি ও দ্বিতীয়টির পর তৃতীয়টিকে গ্রহণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সাত-আট বছরে সূরায়ে বাকারাহ পড়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, 'আমি একটি জিনিস পড়ি, তাকে গ্রহণ করি এবং তারপর সামনে অগ্রসর হই।' বস্তুতঃ চরিত্রগঠনের জন্যে এমনি ক্রমিক, ধারাবাহিক ও অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টারই প্রয়োজন। নিছক অধ্যয়নই এর জন্যে যথেষ্ট নয়। এ উদ্দেশ্য কেবল ক্রমাগত প্রয়াস-প্রচেষ্টার দ্বারাই হাসিল হতে পারে। একথাও খুব ভালবভাবে মনে রাখতে হবে যে, এটা চড়াই-উৎরাইয়ের পথ। সাহস ও আস্থার সাথে অবিরাম প্রচেষ্টার ভেতরেই এ পথের সাফল্য নিহিত। এ পথে ব্যর্থতা আসবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে তার মুকাবেলা করতে হবে। সমস্যা যুদ্ধের আহ্বান জানাবে, কিন্তু তাকে জয় করতে হবে। সংকট বাধার সৃষ্টি করবে, কিন্তু তাকে পরাভূত করতে হবে। এগুলো হচ্ছে এ পথের অনিবার্য পর্যায়। এসব দেখে কি আমরা ভীত কিংবা লক্ষ্যপথ থেকে পিছিয়ে যাবো?

অধ্যাপক খুরশীদ আহমাদ

এক

পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি ঃ তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১. সম্পর্কের ভিত্তি ও মর্যাদা

ইসলামী আন্দোলন এক সামগ্রিক ও সর্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বায়ক। এ জন্যেই এ বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মীদেরকে সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের সংগে এবং বিশেষভাবে পরস্পরের সাথে এর সঠিক ভিত্তির ওপর সম্পৃক্ত করে দেয়া এর প্রধানতম বুনিয়াদী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে ইসলাম এই সম্পর্কের প্রতিটি দিকের ওপরই আলোকপাত করেছে এবং ভিত্তি থেকে খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসকেই নির্ধারিত করে দিয়েছে।

পারস্পরিক সম্পর্ককে বিবৃত করার জন্যে আল্-কুরআনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ বর্ণনাভংগী ব্যবহার করা হয়েছে, বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ -

"মুমিনেরাতো পরস্পরের ভাই।--" –হুজরাত : ১০

দৃশ্যতঃ এটি তিনটি শব্দবিশিষ্ট একটি ছোট্ট বাক্যাংশ মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি, তার আদর্শিক মর্যাদা এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্যে তার গুরুত্ব ও গভীরতা প্রকাশ করার নিমিত্তে এ বাক্যাংশটুকু যথেষ্ট। এ ব্যাপারে একে ইসলামী আন্দোলনের সনদের (Charter) মর্যাদা দেয়া যেতে পারে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী আন্দোলনে লোকদের সম্পর্ক হচ্ছে একটি আদর্শিক সম্পর্ক। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের একত্ব এর গোড়া পত্তন করে এবং একই আদর্শের প্রতি ঈমানের ঐক্য এতে রঙ বিন্যাস করে। দ্বিতীয়তঃ আদর্শিক সম্পর্ক হবার কারণে এটা নিছক কোন নিরস বা ঠুনকো সম্পর্ক নয়। বরং এতে যে স্থিতি,

গভীরতা ও প্রগাঢ় ভালোবাসার সমন্বয় ঘটে, তাকে শুধু দুইভাইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রকাশ করা চলে। এমনি সম্পর্ককেই বলা হয় উখুয়্যাত বা ভ্রাতৃত্ব। বস্তুতঃ একটি আদর্শিক সম্পর্কের ভেতর ইসলাম যে স্থিতিশীলতা, প্রশস্ততা ও আবেগের সঞ্চার করে, ত্যর প্রতিধ্বনি করার জন্যে ভ্রাতৃত্বের (উখুয়্যাত) চেয়ে উত্তম শব্দ আর কি হতে পারে ?

২. ভ্রাতৃত্ব ঈমানের অনিবার্য দাবী

ইসলামী সভ্যতায় ঈমানের ধারণা শুধু এটুকু নয় যে, কতিপয় অতি প্রাকৃতিক সত্যকে স্বীকার করে নিলেই ব্যস্ হয়ে গেল। বরং এ একটি ব্যাপকতর ধারণা বিশিষ্ট প্রত্যয়—যা মানুষের হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করে, যা তার শিরা-উপশিরায় রক্তের ন্যায় সঞ্চালিত হয়। এ এমন একটি অনুভূতি, যা তার বক্ষদেশকে উদ্বেলিত ও আলোড়িত করে রাখে। এ হচ্ছে তার মন-মগজ ও দিল-দিমাগের কাঠামো পরিবর্তনকারী এক চিন্তাশক্তি। সর্বোপরি, এ হচ্ছে এক বাস্তবানুগ ব্যবস্থাপনার কার্যানির্বাহী শক্তি, যা তার সমস্ত অংগ-প্রত্যংগকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে গোটা বক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনেই বিপ্লবের সূচনা করে। যে ঈমান এতোটা ব্যাপক প্রভাবশালী, তার অক্টোপাস থেকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে মুক্ত থাকতে পারে! বিশেষতঃ এটা যখন এক অনস্বীকার্য সত্য যে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে তার গোটা জীবন—একটি নগণ্য অংশ ছাড়া—ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুতঃ এ কারণেই ঈমান তার অনুসারীদেরকে সমস্ত মানুষের সাথে সাধারণভাবে এবং পরস্পরের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করার নির্দেশ দেয়। উপরন্তু ঐ সম্পর্ককে সুবিচার (আদ্‌ল) ও সদাচরণের (ইহ্‌সান) ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সে একটি সামগ্রিক জীবনপদ্ধতি এবং সভ্যতারও রূপদান করে। অন্যদিকে অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিকে সে একটি পূর্ণাংগ বিধি-ব্যবস্থায় পরিণত করে দেয়, যাতে করে নিজ নিজ স্থান থেকে প্রত্যেকেই তাকে মেনে চলতে পারে। এভাবে এক হাতের আঙ্গুলের ভেতর অন্য হাতের আঙ্গুল কিংবা এক ভাইয়ের সংগে অপর ভাই যেমন যুক্ত ও মিলিত হয়, ঈমানের সম্পর্কে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরাও যেনো পরস্পরে তেমনি যুক্ত হতে পারে। আর এ হচ্ছে ঈমানের আদর্শিক মর্যাদার অনিবার্য দাবী। এমন ঈমানই মানব প্রকৃতি দাবী করে এবং এ সম্পর্কেই তার বিবেক সাক্ষ্যদান করে।

যারা সব রঙ বর্জন করে শুধু আল্লাহ্র রঙে রঞ্জিত হয়, তামাম আনুগত্য পরিহার করে কেবল আল্লাহর আনুগত্য কবুল করে, সমস্ত বাতিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু সত্যের সাথে যুক্ত হয় এবং আল্লাহ্রই জন্যে একনিষ্ঠ ও একমুখি হয়, তারাও যদি পরস্পরে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট না হয় এবং প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন না করে, তবে আর কে করবে? উদ্দেশ্যের একমুখিনতার চাইতে আর কি বড় শক্তি রয়েছে, যা মানুষকে মানুষের সাথে যুক্ত করতে পারে! এ একমুখিনতার এবং সত্য পথের প্রতিটি মঞ্জিলই এ সম্পর্ককে এক জীবন্ত সত্যে পরিবর্তিত করতে থাকে। যে ব্যক্তি সত্যের খাতিরে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়, সে স্বভাবতই এ পথের প্রতিটি পথিকের ভালোবাসা, সহানুভূতি, সান্তনা ও পোষকতার মুখাপেক্ষী এবং প্রয়োজনশীল হয়ে থাকে। সুতরাং এ পথে এসে এ নিয়ামতটুকুও যদি সে লাভ না করে তো এতো বড় অভাবকে আর কিছুতেই পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

৩. বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের জন্যে ভ্রাতৃত্ব অপরিহার্য

এ দুনিয়ায় ঈমানের মূল লক্ষ্য (অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি এবং ইসলামী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা) স্বতঃই এক সুদৃঢ়, স্থিতিশীল ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্কের দাবী করে। এ লক্ষ্য অর্জনটা কোনো সহজ কাজ নয়। এ হচ্ছে 'প্রেমের সমীপে পদার্পণ করার সমতুল্য'[১]। এখানে প্রতি পদক্ষেপে বিপদের ঝড়-ঝন্ঝা ওঠে, পরীক্ষার সয়লাব আসে। স্পষ্টত এমনি গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্যে প্রতিটি ব্যক্তির বন্ধুত্ব অতীব মূল্যবান। এর অভাব অন্য কোনো উপায়েই পূর্ণ করা চলে না। বিশেষত এ পথে সমর্থক-সহায়কের অভাব এক স্বাভাবিক সত্য বিধায় এমনি ধরনের শূন্যতাকে এক মুহূর্তের জন্যেও বরদাশ্ত করা যায় না।

উপরন্তু একটি সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী জামায়াত ছাড়া কোন সামগ্রিক বিপ্লবই সংঘটিত হতে পারে না। আর সংহত ও শক্তিশালী জামায়াত ঠিক তখনই জন্ম লাভ করে, যখন তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ পরস্পরে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যে এমনি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত, যাতে তা স্বভাবতই এক 'সীসার প্রাচীরে' পরিণত হবে (بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ); তার ভেতরে কোনো বিভেদ বা অনৈক্য পথ খুঁজে পাবে না। বস্তুত এমনি সুসংহত প্রচেষ্টাই সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

---

(১) يه شهادت كه الفت ميں قدم ركهنا

আল্লাহ্ তায়ালা সূরায়ে আলে ইমরানে একটি নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের এমন সম্পর্ক গড়ে তোলবারই নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং মুকাবেলায় দৃঢ়তা আবলম্বন কর। আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পারো।"

আলে ইমরান : ২০০

সূরায়ে আন্‌ফালের শেষদিকে ইসলামী বিপ্লবের পূর্ণতার জন্যে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ককে একটি আবশ্যিক শর্ত হিসেবে সামনে রাখা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে ঃ যারা এই দ্বীনের প্রতি ঈমান আনবে, এর জন্য সব কিছু ত্যাগ করবে এবং এই আন্দোলনে নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে নিশ্চিতরূপে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক। এ সম্পর্কের জন্যে এখানে 'বন্ধুত্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে,স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছে, তারা একে অপরের বন্ধু।" – আনফাল : ৭২

এখান থেকে আরো কিছুটা সামনে এগিয়ে কাফেরদের সাংগঠনিক ঐক্য এবং তাদের দলীয় শক্তির প্রতি ইশারা দিয়ে বলা হয়েছে যে, মুলমমানরা যদি এমনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে না তোলে তবে আদল, ইহ্‌সান ও খোদাপরস্তির ভিত্তিতে একটি বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের আকাংক্ষা কখনো বাস্তব দুনিয়ায় দৃঢ়মূল হতে পারবে না। ফলে আল্লাহর এই দুনিয়া ফেতনা–ফাসাদে পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা এ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছাড়া বিপ্লবের বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর মুকাবেলা করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

"আর যারা কাফের তারা পরস্পরপরস্পরের বন্ধু, সহযোগী। তোমরা (ঈমানদার লোকেরা) যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস তাহলে যমীনে বড়ই ফেৎনা ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।" –আনফাল : ৭৩

আর একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে এমন প্রয়াস-প্রচেষ্টাই হচ্ছে ঈমানের সত্যাসত্য নির্ণয়ের প্রকৃত মানদন্ড।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا -

"যারা ঈমান এনেছে নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবংযারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তারাই প্রকৃত মুমীন।" – আনফাল : ৭৪

এরই কিছুটা আগে আল্লাহ তায়ালা বিরুদ্ধবাদীদের মুকাবেলায় আপন সাহায্যের প্রতিশ্রুতির সাথে মু'মিনদের জামায়াত সম্পর্কে নবী কারীম (সা)কে এই বলে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের দিলকে তিনি নিবিড়ভাবে জুড়ে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের চাবিকাঠি।

هُوَالَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

"তিনিই তো নিজের সাহায্য দ্বারা ও মুমিনদের দ্বারা তোমার সহায়তা করেছেন এবং মুমিনদের দিলকে পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন।" - আনফাল: ৬২–৬৩

৪. ভ্রাতৃত্বের দাবী ঃ তার গুরুত্ব ও ফলাফল

বস্তুত ইসলামী বিপ্লবের আহ্বায়কদের এ পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব (উখুয়্যাত), বন্ধুত্ব, রহমত ও ভালোবাসার সম্পর্ক। কিন্তু এর ভেতর 'ভ্রাতৃত্ব'

শব্দটি এত ব্যাপক অর্থবহ যে, অন্যান্য গুণরাজিকে সে নিজের ভেতরেই আত্মস্থ করে নেয়। অর্থাৎ দুই সহোদর ভাই যেমন একত্রিত হয় এবং তাদের মধ্যকার কোনো মত-পার্থক্য, ঝগড়া-ফাসাদ বা বিভেদ-বিসম্বাদকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পরস্পরকে ঠিক তেমনিভাবে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। দুইভাই যেমন পরস্পরের জন্যে নিজেদের সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়, পরস্পর পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়, সাহায্য ও সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকে এবং একে অপরের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়; যেভাবে এক তীব্র প্রেমের আবেগ ও প্রাণ-চেতনার সঞ্চার করে, সত্য পথের পথিকদের (যারা দ্বীন ইসলামের খাতিরে নিজেদের গোটা জীবনকে নিয়োজিত করে দেয়) মধ্যে ঠিক তেমনি সম্পর্কই গড়ে ওঠে। মোটকথা ইসলামী বিপ্লবের প্রতি যে যতোটা গভীরভাবে অনুরক্ত হবে, আপন সাথী ভাইয়ের সংগে ততোটা গভীর সম্পর্কই সে গড়ে তুলবে। তেমনি এ উদ্দেশ্যটা যার কাছে যতো প্রিয় হবে, তার কাছে এ সম্পর্কও ততোখানি প্রিয় হবে। কারণ এ সম্পর্ক হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে এবং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারীদের। কাজেই যে ব্যক্তি ইসলামী বিপ্লবের কর্মী ও আহ্বায়ক হবে, আপন সাথী ভাইয়ের সংগে তার সম্পর্ক যদি পথ চলাকালীন অপরিচিত লোকের মতো হয় তবে তার নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, সে কোন্ পথে এগিয়ে চলেছে। অথবা আপন সংগী-সহকর্মীদের সাথে তার সম্পর্ক যদি গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়া ধুলোর মতো ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে তার চিন্তা করে দেখতে হবে যে, যে উদ্দেশ্যের প্রতি সে ভালোবাসার দাবী করে, তার দিলে তার কতোটা মূল্য রয়েছে।

ভ্রাতৃত্বের এ সম্পর্কের জন্যেই নবী কারীম (সা) اَلْحُبُّ لِلّٰهِ (আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা)-এর মত পবিত্র, ব্যাপক ও মনোরম পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। 'ভালোবাসা' নিজেই এক বিরাট চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিমধুর পরিভাষা। এরসাথে 'আল্লাহ্‌র পথে' এবং 'আল্লাহ্ জন্যে' বিশ্লেষণদ্বয় একে তামাম স্থূলতা ও অপবিত্রতা থেকে মহত্ত্বের উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এমনিভাবে এ পরিভাষাটি দিল ও আকলকে যুগপৎ এমন এক নির্ভুল মানদণ্ড দান করে, যা দিয়ে প্রত্যেক মু'মিন তার সম্পর্ককে যাচাই করে দেখতে পারে।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তার পথে ভালোবাসা এ দু'টো জিনিসের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে এর একটি থাকবে, সেখানে অপরটিও দেখা যাবে।

একটি যদি না থাকে তবে অপরটি সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়াবে। তাই নবী কারীম (স) বলেছেন ঃ

لَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا

"তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতোক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে।"
-(মুসলিম-আবু হুরায়রা)

অতঃপর গোটা সম্পর্ককে এই ভিত্তির ওপর স্থাপন করা এবং ভালোবাসা ও শত্রুতাকে শুধু আল্লাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়াকে ঈমানের পূর্ণতার জন্যে অপরিহার্য শর্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ اَعْطٰي لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ

"যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্‌র জন্যে ভালোবাসলো, আল্লাহ্‌র জন্যে শত্রুতা করলো, আল্লাহ্‌র জন্যে কাউকে কিছু দান করলো এবং আল্লাহ্‌র জন্যেই কাউকে বিরত রাখলো, সে তার ঈমানকেই পূর্ণ করে নিলো।"

মানুষের জীবনে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা বাস্তাবিকই অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে থাকে। তাই ঈমানের পূর্ণতার জন্যে এ দু'টো জিনিসকেই আল্লাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়ার অপিহার্য শর্ত নিতান্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। ঈমানের বহুতর শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর প্রতিটি শাখাই নিজ নিজ জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুসংহত শক্তিকে ক্ষমতাসীন করার জন্যে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা যেরূপ জরুরী তার পরিপ্রেক্ষিতে নবী কারীম (সা) তাকে সমস্ত কাজের চাইতে শ্রেষ্ঠ কাজ বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আবুজার (রা) বর্ণনা করেন ঃ

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ قَائِلٌ اَلصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَقَالَ قَائِلٌ اَلْجِهَادُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ -

'একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে আগমন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি জানো, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কোন কাজটি সবচেয়ে বেশী প্রিয়? কেউ বললো নামাজ ও জাকাত। কেউ বললো জিহাদ। মহানবী (সা) বললেনঃ কেবল আল্লাহ্র জন্যে ভালোবাসা এবং আল্লাহ্র জন্যে শত্রুতাই হচ্ছে সমস্ত কাজের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে বেশী প্রিয়।' –(আহমদ, আবু দাউদ, আবু যররো)

আর একবার হযরত আবুজার (রা)কে উদ্দেশ্য করে মুহাম্মদ (সা) প্রশ্ন করেন ঃ

يَا اَبَاذَرٍّ اَىُّ عُرَى الْاِيْمَانِ اَوْثَقُ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ

قَالَ اَلْمُوَالَاةُ فِى اللّٰهِ وَالْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ –

'হে আবুজার! ঈমানের কোন্ কাজটি অধিকতর মজবুত? জবাব দিলেন, খোদা ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।মহানবী (সা) বললেনঃ তা হচ্ছে আল্লাহ্র পথে বন্ধুত্ব এবং তার জন্যে ভালোবাসা ও শত্রুতা।' –(বায়হাকী-ইবনে আব্বাস)

হাদীসে উল্লেখিত عُرَى বলতে রজ্জু এবং থালা-বাসনের আংটা বা হাতলকেও বুঝায়। তাছাড়া যে গাছের পাতা শীতকালে ঝরে না, তাকেও عُرَى বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ভালোবাসা হচ্ছে এমন মজবুত ভিত্তি, যার ওপর নির্ভর করে মানুষ নিশ্চিন্তে ঈমানের চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে। এমন ভিত্তিতে না কখনো ফাটল ধরে, আর না তা ধসে পড়ে।

মোটকথা, ঈমান মানুষের গোটা জীবনকেই দাবী করে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই—যতোক্ষণ দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা যাওয়া অব্যাহত থাকবে —ঈমানের চাহিদা অনুযায়ী অতিবাহিত করা উচিৎ। কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত মু'মিনের গোটা সম্পর্ক-সম্বন্ধ আল্লাহ্র জন্যে ভালোবাসার সম্পর্কে পরিণত না হবে ততোক্ষণ জীবনে এতো ব্যাপকভাবে নেক কাজের সূচনা হতে পারে না। এ জন্যে যে, সম্পর্ক–সম্বন্ধ হচ্ছে মানব জীবনের এক বিরাট অংশ। এ জিনিসটি অনিবার্যভাবে তার জীবনকে প্রভাবান্বিত করে এবং এক প্রকারে তার বন্ধুত্ব ও দ্বীনের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। তাই যাদের জীবনে খোদার স্মরণ দৃঢ় মূল হয়েছে, তাদের সাথে আপন সত্তাকে যুক্ত করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তারা যাতে সত্য পথে চালিত হয় এবং দুনিয়ার শান-শওকত ও সাজসজ্জার

গোলক–ধাঁধায় পড়ে নিজেদের চক্ষুকে বিভ্রান্ত না করে, তার জন্যে 'সবর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

'তুমি স্বীয় সত্তাকে তাদের সংগে সংযত রাখো, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আপন প্রভূকে ডাকে এবং তার সন্তুষ্টি তালাশ করে ' আর দুনিয়াবী জীবনের চাক্‌চিক্য কামনায় তোমাদের দৃষ্টি যেনো তাদের দিক থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যদিকে ছুটে না যায়।' –সূরা ক্বাহাফ

অন্যদিকে মানুষকে তার বন্ধুত্ব স্থাপন খুব ভেবে চিন্তে করার জন্যে নবী কারীম (সা) সাবধান করে দিয়েছেন। কেননা ঃ

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ

(احمد ترمذی- ابوداؤد بیهقی- ابوهریرة)

'মানুষ তার বন্ধুর (খলীল) দ্বীনের ওপরই কায়েম থাকে। কাজেই তোমরা কাকে বন্ধু বানাও তা প্রত্যেকেই ভেবে-চিন্তে নাও।' (আবু হুরায়রা রা. থেকে)

হাদীসে উল্লেখিত خَلِيْلٌ শব্দটি থেকে خِلَّةٌ নিষ্পন্ন হয়েছে। এর মানে হচ্ছে এমন ভালোবাসা ও আন্তরিকতা, যা দিলের ভেতর বদ্ধমূল হয়ে যায়। হাদীসে ভালো ও মন্দ লোকের ভালোবাসা ও সাহচর্যের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ভালো লোকের সাহচর্য হচ্ছে কোনো আতর বিক্রেতার কাছে বসার মতো, যদি আতর না পাওয়া যায়, তবু তার খুশ্‌বুতে দিল-দিমাগ সতেজ হয়ে উঠবে। আর মন্দ লোকের সংস্পর্শ হচ্ছে লোহার দোকানের তুল্য; তাতে কাপড় না পুড়লেও তার কালি এবং ধোঁয়া মন-মেজাজ খারাপ করে দিবেই।

ঈমানের একটি স্তরে এসে মানুষ নিজেই ঈমান এবং তার বাস্তব দাবী পূরণে এক বিশেষ ধরনের আনন্দ ও মাধুর্য অনুভব করে। এ আনন্দানুভূতির কারণেই মানুষের ভেতর নেক কাজের প্রেরণা জাগে। রাসূলে কারীম (সা) এই জিনিসটাকেই

حَلَاوَتُ الْاِيْمَانِ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এর তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে এই ঃ

اَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ ـ

'সে অন্য লোককে ভালোবাসবে এবং তার এ ভালোবাসা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যে হবে না।' – (বুখারী, মুসলিম)

গোলাম ও বান্দাহ যদি তার মালিক ও মনিবের ভালোবাসা অর্জন করতে পারে তো তার চাইতে বড়ো সৌভাগ্য আর কি হতে পারে!

একজন মু'মিন যদি আল্লাহ্ তায়ালার ভালোবাসা লাভ করে তো এ বিরাট সম্পদের বিনিময়ে সে আর কি জিনিস পেতে পারে! বস্তুত এ ভালবাসাই হচ্ছে মু'মিনের পক্ষে মিরাজ স্বরূপ। নবী কারীম (সা) বলেছেন–'যারা আল্লাহ্র জন্যে পরস্পরের বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে, তারাই এ বিরাট নিয়ামতের উপযুক্ত।' তাই হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রা) বলেন ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِى الْمُتَجَالِسِيْنَ فِى الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ ـ

'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ 'যারা আমার জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার জন্যে একত্রে উপবেশন করে, আমার জন্যে পরস্পরে সাক্ষাত করতে যায় এবং আমার জন্যে পরস্পরে অর্থ ব্যয় করে, তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা অনিবার্য।' –(মালেক)

৫. আখিরাতে ভ্রাতৃত্বের সুফল

দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র জন্যে ভালোবাসার এ ফলাফল তো আছেই; কিন্তু আখিরাতে যখন মানুষের প্রতিটি নেক কাজই মূল্যবান বিবেচিত হবে এবং একটি মাত্র খেজুরের সাদকা ও একটি ভালো কথাও তার জন্যে গণীমত বলে সাব্যস্ত

হবে, তখন এ সম্পর্ক একজন মু'মিনকে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় অভিষিক্ত করবে। বস্তুত ইসলামী বিপ্লবের ব্যাপারে এ সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি, তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুবই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

সেদিন অন্যের সম্পর্কে কারো কোন হুশ থাকবে না। মানুষ তার মা-বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সবকিছু ছেড়ে দূরে পালিয়ে যাবে। জাহান্নাম থেকে বাঁচবার জন্যে তাদের সবাইকে বিনিময় দিতেও সে তৈরি হবে। সেদিন বন্ধুত্বের তামাম রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার জীবনে যাদের ভালোবাসা দিল ও দিমাগে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো, সে বন্ধুই সেখানে শত্রুতে পরিণত হবে। কিন্তু প্রকৃত খোদাভীরু লোকদের বন্ধুত্ব সেখানে বজায় থাকবে। এজন্যে যে, সেদিন কাজে লাগাবার মতো কি জিনিস সে বন্ধুরা দুনিয়ার জীবনে পরস্পরকে দান করেছে, সেই সংকট মুহূর্তে তা নির্ভুলভাবে জানা যাবে এবং তার গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুভূত হবে ঃ

اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ط يٰعِبَادِ

لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ـ

'যারা পরস্পরের বন্ধু ছিল, সেদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, কেবল মুত্তাকি লোক ছাড়া। হে আমার বান্দাহ্গণ, আজকে তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমরা ভীত সন্ত্রস্তও হবে না।' —(সূরা যুখরাদ)

এভাবে যাদের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে, তাদের সাথেই তার পরিণাম যুক্ত হবে। এমনকি আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা পোষণকারীগণ যদি একজন থাকে প্রাচ্যে এবং অপর জন পাশ্চাত্যে তবুও মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করে বলবেন, যার প্রতি তুমি আমার জন্যে ভালোবাসা পোষণ করতে সে লোকটি হচ্ছে এই। হাদীসের বর্ণনা এমন ঃ

(١) اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

(٢) لَوْاَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاحِدٌ فِى الْمَشْرِقِ وَاٰخَرُ فِى الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتَ تُحِبُّهٗ فِىَّ

১। "মানুষ যে যাকে ভালোবাসে তার সাথেই তার পরিণাম সংযুক্ত।"
(বুখারী, মুসলিম ; ইবনে মাসউদ রা.)

২। "আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা পোষণকারী দু'ব্যক্তির একজন যদি থাকে প্রাচ্যে এবং অপরজন যদি থাকে পাশ্চাত্যে তবুও আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাদের উভয়কে কিয়ামতের দিন একত্রিত করে বলবেন, যার প্রতি তুমি আমার জন্যে ভবলোবাসা পোষণ করতে সে ব্যক্তিটি হচ্ছে, এই-।' (বায়হাকী ; আবু হুরায়রা রা.)

সেদিন মানুষের পায়ের নিচে আগুন উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে, মাথার ওপরে থাকবে আগুনের মেঘ এবং তা থেকে বর্ষিত হতে থাকবে আগুনের ফুল্‌কি। ডানে, বামে, সামনে, পেছনে শুধু আগুনই তাকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে আর তার আশ্রয় লাভের মতো একটি মাত্র ছায়াই থাকবে। আর তা হচ্ছে আরশে ইলাহীর ছায়া। সেদিন এ ছায়াতে সাত শ্রেণীর লোক স্থান পাবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

رَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ -

'তাদের ভেতর এমন দু'জন লোক থাকবে, যারা আল্লাহ্‌র জন্যে পরস্পরকে ভালোবেসেছে, তারই জন্যে একত্রিত হয়েছে এবং তারই খাতিরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।'

তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক যে, তিনি আমাদের কাছে তাঁর এ ফরমান পৌঁছে দিয়েছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِىَّ بِجَلَا لِىْ اَلْيَوْمَ اَظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلِّىْ

'আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসতো, তারা আজ কোথায়! আজকে আমি তাদেরকে নিজের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবো। আজকে আমার ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া নেই।'
(মুসলিম-আবু হুরাইরা)

আর যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা নিম্নরূপ সংবাদ দিয়েছেন তাদের জন্যে তো কতোই মর্যাদার ব্যাপার হবে ঃ

اَلْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِّنْ نُّوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ ـ

'যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের খাতিরে পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের জন্যে আখিরাতে নূরের মিম্বর তৈরি হবে এবং নবী ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন।'
(তিরমিযী-মুয়াজ বিন জাবল)

৬. পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব

আল্লাহ্‌র জন্যে এক ঈমানের ভিত্তিতে পরস্পরের এ গভীর স্থিতিশীল ও প্রেমের আবেগময় সম্পর্ক ইসলামী আন্দোলনের জন্যে এতোখানি গুরুত্বপূর্ণ যে, এর বিকৃতিকে অত্যন্ত উদ্বেগের চোখে দেখা হয়েছে। পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কে যে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে, পরস্পরে আপোষ-মীমাংসা করা ও করানোর ব্যাপার যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং সম্পর্ক বিকৃতকারীদের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তো পরে আসবে কিন্তু এখানে একথা মনে রাখা দরকার যে, সম্পর্কের বিকৃতি ও বিদ্বেষ পোষণকে নবী কারীম (সা) এমন এক অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন যা গোটা দ্বীনকেই একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয় ঃ

هِىَ الْحَالِقَةُ لَاأَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

(احمد وترمذى -زبير)

এ সম্পর্কের প্রভাব কতো ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে, তা এ থেকেই বোঝা যায়। যারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এ দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, আপন সঙ্গী-সাথীদের জন্যে তাদের অন্তঃকরণ থেকে ক্রমাগত প্রেমের ঝর্ণাধারা উৎসারিত হবে। তাদের কাছে এ সম্পর্ক এতোটা প্রিয় হবে এবং তাদের হৃদয়ে এর জন্যে এতোখানি মূল্যবোধের সৃষ্টি হবে যে অন্য যে কোনো ক্ষতি স্বীকারে তারা প্রস্তুত হবে; কিন্তু এর কোনো অনিষ্ট তারা বরদাশ্‌ত করবে না।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এই পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা তথা প্রীতির সম্পর্ককেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর শ্রেষ্ঠতম নিয়ামতরে মধ্যে গণ্য করেছেন। আর

যে ইসলামী জামায়াত এই অমূল্য সম্পদ লাভ করবে, তার প্রতি বর্ষিত হবে তার বিশেষ করুণা-আশির্বাদ। কেননা এ সম্পর্কই হচ্ছে ইসলামী জামায়াতের প্রাণবস্তু এবং তার সজীবতার লক্ষণ। এ সম্পর্ক তার লোকদের জন্যে এমন এক পরিবেশ রচনা করে, যাতে তারা একে অপরের পৃষ্ঠপোষক হয়ে সত্য পথের মঞ্জিল নির্ধারণ করতে থাকে; পরস্পর পরস্পরকে পূণ্যের পথে চালিত করার জন্যে হামেশা সচেষ্ট থাকে। প্রথম যুগের ইসলামী জামায়াতকে আল্লাহ্ তায়ালা পারস্পরিক ঐক্য, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের যে বিরাট সম্পদ দান করেছিলেন, সূরা আলে ইমরানে তার উল্লেখ করে তাকে তাঁর বিশেষ নিয়ামত বলে অভিহিত করা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ـ

'আর আল্লাহ্‌র সে নিয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়কে জুড়ে দিলেন আর তোমরা তাঁর মেহেরবানীর ফলে ভাই ভাই হয়ে গেলে।' – (আল ইমরান ঃ ১০৩)

অতঃপর সূরায়ে আনফালে নবী কারীম (সা)কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও মুসলমানদের দিলকে এমন প্রেম, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে জুড়ে দেয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না। এটা কেবল আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতেই সম্ভবপর হয়েছে–একমাত্র তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভবপর ছিলো। তিনি মানুষকে একটি দ্বীন দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান ও ভালোবাসা পোষণের তাওফিক দিয়েছেন। তারই অনিবার্য ফল হচ্ছে এই প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা।

দুই

চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ইসলাম পারস্পরিক সম্পর্কের যে মান নির্ধারণ করেছে তাকে কায়েম ও বজায় রাখার জন্যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে একটি বিধি-বিধানও তৈরি করে দিয়েছেন। সেই বিধি-বিধানকে অনুসরণ করে এ সম্পর্ককে অনায়াসে দ্বীন-ইসলামের অভীষ্ট মানে উন্নীত করা যেতে পারে। এ বিধি-বিধানের ভিত্তি কতিপয় মৌলিক বিষয়ের ওপর স্থাপিত। এগুলো যদি মানুষ তার নৈতিক জীবনে গ্রহণ ও অনুসরণ করে তাহলে ঐ অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত প্রতিটি জিনিসই এই মৌলিক গুণরাজির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে প্রকাশ পেতে থাকবে। অন্য কথায় বলা যায়, এই গুণরাজি এক একটি কর্তব্য পালন এবং এক একটি মর্যাদা লাভের জন্যে মানুষের ভেতর থেকে ক্রমাগত তাকিদ ও দাবী জানাতে থাকবে। এর ফলে প্রতি পদক্ষেপেই সদুপদেশ বা সতর্কবাণীর প্রয়োজন হবে না। এই গুণরাজির মধ্যে সবচেয়ে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে কল্যাণ কামনা।

১. কল্যাণ কামনা

হাদীস শরীফে কল্যাণ কামনার জন্যে 'নছিহত' (نَصِيْحَتْ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থপূর্ণ। এ কারণে নবী কারীম (সঃ) এ পর্যন্ত বলেছেন (ثَلَاثًا) اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ 'দ্বীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা'। (এ বাক্যটি তিনি এক সঙ্গে তিনবার উচ্চারণ করেছেন)-মুসলিম।

এরপর অধিকতর ব্যাখ্যা হিসেবে যাদের প্রতি কল্যাণ কামনা করা উচিত, তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের কথাও উল্লেখ

রয়েছে। এভাবে একবার মহানবী (সা) তাঁর কতিপয় সাহাবীদের কাছ থেকে সাধারণ মুসলমানদের জন্যে কল্যাণ কামনার (নছিহত) বাইয়াত গ্রহণ করেন। আভিধানিক অর্থের আলোকে এ শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সম্পর্কের ভেতর কোনো ভেজাল বা ত্রুটি না থেকে যায়। অন্যকথায় এ গুণটি আমরা এভাবে নির্ধারণ করতে পারি যে মানুষ তার ভাইয়ের কল্যাণ ও মঙ্গল চিন্তায় সর্বদা প্রভাবান্বিত থাকবে; তারই মঙ্গল সাধনের জন্যে প্রতিটি মুহূর্ত অস্থির ও উদগ্রীব থাকবে, তারই উপকার করার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা করবে, তার কোনো ক্ষতি বা কষ্ট স্বীকার করবে না। বরং দ্বীন ও দুনিয়াবী যে কোন দিক দিয়ে সম্ভব তার সাহায্য করার প্রয়াস পাবে। এ কল্যাণ কামনার প্রকৃত মানদণ্ড হচ্ছে যে মানুষ তাঁর নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে, তার ভাইয়ের জন্যে ঠিক তাই পছন্দ করবে। কারণ, মানুষ কখনো তার আপন অকল্যাণ কামনা করতে পারে না। বরং নিজের জন্যে সে যতটুকু সম্ভব ফায়দা, কল্যাণ ও মঙ্গল বিধানেই সচেষ্ট থাকে। নিজের অধিকারের বেলায় সে এতটুকু ক্ষতি স্বীকার করতে পারে না, নিজের ফায়দার জন্যে সময় ও অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করে না, নিজের অনিষ্টের কথা সে শুনতে পারে না, নিজের বে-ইজ্জতি কখনো বরদাশ্ত করতে পারে না বরং নিজের জন্যে সে সর্বাধিক পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পেতে আগ্রহী। অতএব কল্যাণ কামনার মানে হচ্ছে এই যে, মানব চরিত্রে উল্লেখিত গুণসমূহ পয়দা হতে হবে এবং সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে, তার ভাইয়ের জন্যেও ঠিক তাই পছন্দ করবে। এমনি ধারায় তার আচার-আচরণ বিকাশ লাভ করতে থাকবে।

মু'মিনের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই রাসূলে কারীম (সা) ঈমানের এক আবশ্যিক শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ

'যে মহান সত্তার হাতে আমার জান নিবদ্ধ তার কসম! কোনো বান্দাহ্ ততোক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতোক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে তার ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ করবে।' (বুখারী ও মুসলিম-আনাম)

এভাবে এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা

বলা হয়েছে; তার মধ্যে এ কল্যাণ কামনাকে একটি হাদীসে নিম্নোক্তরূপে বিবৃত করা হয়েছে ঃ

وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْشَهِدَ

অর্থাৎ 'সে আপন ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে, সে উপস্থিত থাকুক আর অনুপস্থিত।' (নিসায়ী-আবু হুরাইর রাঃ)

অন্য এক হাদীসে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের প্রতি মুসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে, তার একটি হচ্ছে এই ঃ

وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে তার জন্যেও তা-ই পছন্দ করে।'
(তিরমিযী, ফাবেসী- আলী রাঃ)

আরো সামনে এগিয়ে আমরা দেখতে পাবো, কল্যাণ কামনার এ গুণটির ভেতর কতো অধিকার ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে, যা সরাসরি এর অনিবার্য দাবী হিসেবেই এসে পড়ে।

২. আত্মত্যাগ (اِيْثَارْ)

একজন মুসলমান যখন তার ভাইয়ের জন্যে শুধু নিজের মতোই পছন্দ করে না বরং তাকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, তখন তার এ গুণটিকেই বলা হয় اِيْثَارْ বা আত্মত্যাগ। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় মৌলিক গুণ। اِيْثَارْ শব্দটি اَثَرٌ থেকে নির্গত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে পা ফেলা বা অগ্রাধিকার দেয়া। অর্থাৎ মুসলমান তার ভাইয়ের কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তাকে নিজের কল্যাণ ও মঙ্গলের ওপর অগ্রাধিকার দেবে। নিজের প্রয়োজনকে মূলতবী রেখে অন্যের প্রয়োজন মেটাবে। নিজে কষ্ট স্বীকার করে অন্যকে আরাম দেবে। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অন্যের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। নিজের জন্যে দরকার হলে স্বভাব-প্রকৃতির প্রতিকূল জিনিস মেনে নেবে, কিন্তু স্বীয় ভাইয়ের দিলকে যথাসম্ভব অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করবে।

বস্তুত এ হচ্ছে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এটা সবার কাছ থেকে আশা করা যায় না। কারণ এর ভিত্তিমূলে কোনো অধিকার বা কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়া হয় নি। অবশ্য এর ভিত্তিতে অপরিসীম চারিত্রিক মহত্ত্বের কথা বিবৃত হয়েছে।

এ আত্মত্যাগ সর্বপ্রথম প্রয়োজন-সীমার মধ্যে হওয়া উচিত। তারপর আরাম আয়েসের ক্ষেত্রে এবং সর্বশেষ স্বভাব-প্রকৃতির ক্ষেত্রে। এ সর্বশেষ জিনিসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ স্বভাবতই বিভিন্ন প্রকৃতির, সেহেতু তাদের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদাও বিভিন্ন রূপ। এমতাবস্থায় প্রতিটি মানুষই যদি তার প্রকৃতির চাহিদার ওপর অনড় হয়ে থাকে তাহলে মানবসমাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য। পক্ষান্তরে সে যদি অন্যের রুচি, পছন্দ, ঝোঁক-প্রবণতাকে অগ্রাধিকার দিতে শেখে তাহলে অত্যন্ত চমৎকার ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

এ আত্মত্যাগেরই উচ্চতর পর্যায় হচ্ছে, নিজে অভাব-অনটন ও দূরবস্থার মধ্যে থেকে আপন ভাইয়ের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চাইতে অগ্রাধিকার দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গী-সাথীদের জীবন এ ধরনেরই ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। আল কুরআনেও তাদের এ গুণটির প্রশংসা করা হয়েছে ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

'এবং তারা নিজের উপর অন্যান্যদের (প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা রয়েছে অনটনের মধ্যে।' (সূরা হাশর ঃ ৯)

বস্তুত নিজেদের অভাব-অনটন সত্ত্বেও আনসারগণ যেভাবে মুহাজির ভাইদের অভ্যর্থনা করেছে এবং নিজেদের মধ্যে তাদেরকে স্থান দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে আত্মত্যাগের আদর্শ দৃষ্টান্ত। উপরোক্ত আয়াতের শানে নযুল হিসেবে, হযরত আবু তালহা আনসারীর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। ঘটনাটি থেকে এর একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় ঃ

'একদিন রাসূলে কারীম (সা)-এর কাছে একজন ক্ষুধার্ত লোক এলো। তখন তাঁর গৃহে কোনো খাবার ছিলো না। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমান হিসেবে রাখবে, আল্লাহ্ তার প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন। হযরত আবু তাল্হা লোকটিকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঘরে গিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, ঘরে শুধু মেহমানের পেট ভরার মতো খাবারই আছে। তিনি বললেন ঃ ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে বাতি নিভিয়ে দাও। আমরা উভয়ে সারা রাত অভুক্ত থাকবো। অবশ্য মেহমান বুঝতে পারবে যে আমরাও খাচ্ছি। অবশেষে তারা তাই করলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির হলে তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ তায়ালা তোমার এ সদাচরণে অত্যন্ত খুশী

হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে এ আয়াতটি পড়ে শুনালেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

এ তো হচ্ছে আর্থিক অনটনের মধ্যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর চাইতেও চমৎকার ঘটনা হচ্ছে এক জিহাদের, যাকে আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা বলা যায়। ঘটনাটি হচ্ছেএই ঃ

যুদ্ধের ময়দানে একজন আহত লোকের কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হলো। ঠিক সে মুহূর্তে নিকট থেকে অপর একজন লোকের আর্তনাদ শোনা গেলো। প্রথম লোকটি বললো ঃ ঐ লোকটির কাছে আগে নিয়ে যাও। দ্বিতীয় লোকটির কাছে গিয়ে পৌঁছলে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো এবং সে মুমূর্ষাবস্থায়ও লোকটি নিজের সঙ্গীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিলো। এভাবে ষষ্ঠ ব্যক্তি পর্যন্ত একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলো এবং প্রত্যেকেই নিজের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে লাগলো। কিন্তু ষষ্ঠ ব্যক্তির কাছে গিয়ে দেখা গেলো, তার জীবনপ্রদীপ ইতিমধ্যে নিভে গেছে। এভাবে প্রথম লোকটির কাছে ফিরে আসতে আসতে একে একে সবারই জীবনাবসান হলো।

আত্মত্যাগের অন্য একটি অর্থ হচ্ছে, নিজে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের জিনিসে তুষ্ট থাকা এবং নিজের সাথীকে উৎকৃষ্ট জিনিস দান করা। একবার রাসূলাল্লাহ (সা) একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দু'টি মেসওয়াক কাটলেন, তার একটি ছিলো সোজা এবং অপরটি বাঁকা। তাঁর সঙ্গে একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি সোজা মেসওয়াকটি তাঁকে দিলেন এবং বাঁকাটি রাখলেন নিজে। সাহাবী বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'এটি ভালো এবং আপনার জন্যে উত্তম।' তিনি বললেন ঃ কেউ যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে একঘন্টা পরিমাণও সংশ্রব রাখে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, এ লোকটি কি সংশ্রবকালীন হক আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে কিংবা তাকে নষ্ট করেছে? (কিমিয়ায়ে সায়াদাত) বস্তুত আত্মত্যাগ যে সংশ্রবেরও একটি হক এদ্বারা তার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

৩. আদল (সুবিচার)

চরিত্রের দু'টো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গুণ হচ্ছে আদল ও ইহসান। মু'মিন যদি এ গুণ দুটো অনুসরণ করে, তাহলে শুধু সম্পর্কচ্ছেদের কোনো কারণই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না তাই নয়, বরং সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর হয়েও উঠবে। তাই এগুণ

দু'টো সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা আদেশসূচক ভঙ্গীতে এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

'আল্লাহ্ তায়ালা আদল ও ইহ্সানের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন।'
(সূরা নাহ্‌ল ঃ ৯)

এখানে 'আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন'–এ বাচন-ভঙ্গীটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আদল সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে দু'টো মৌলিক সত্য নিহিত রয়েছে। প্রথমতঃ লোকদের অধিকারের বেলায় সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকের অধিকার স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বুঝে দিতে হবে। আর 'আদলের নির্দেশ' এর দাবী এই যে, প্রতিটি লোকের নৈতিক, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত প্রাপ্যাধিকারকে পূর্ণ ঈমানদারীর সঙ্গে আদায় করতে হবে। অর্থাৎ একজন মুসলমান তার ভাইয়ের সকল শরীয়াতসম্মত প্রাপ্যাধিকার আদায় করবে, শরীয়াতের ইচ্ছানুযায়ী নিজের প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, শরীয়াতের দাবী অনুযায়ী আচরণ করবে, শরীয়াতের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করবে। কেননা, শরীয়াতের মধ্যেই আদলের সমস্ত বিধি-বিধান পরিপূর্ণ এবং সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"এবং আমি তাদের (রাসূলদের) সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মানদণ্ড, ন্যায়নীতি—যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। (হাদীদ ঃ ২৫)

অনুরূপভাবে শরীয়াত এটাও দাবী করে যে, কারো কাছ থেকে অনিষ্টকারিতার বদলা নিতে হলে যতটুকু অনিষ্ট করা হয়েছে ততোটুকুই নেবে। যে ব্যক্তি এর চাইতে সামনে অগ্রসর হলো সে আদলেরই বিরুদ্ধাচরণ করলো।

আদলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পূর্নাঙ্গ ধারণা নবী কারীম (সা)-এর একটি হাদীসে বিবৃত হয়েছে। উক্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নির্দেশিত নয়টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই ঃ

كَلِمَةُ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ

'গজবের অবস্থা হোক আর সন্তুষ্টির, যে কোনো অবস্থায় আদলের বাণীর ওপর কায়েম থাকো।'

প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের বুনিয়াদী লক্ষণ এই যে, মানুষের অন্তঃকরণের অবস্থা যাই হোক সে আদলের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। তার ভেতর এতোটা চরিত্রবল থাকতে হবে যে, তার ভাইয়ের সাথে তার যতোই মনোমালিন্য বা মন কষাকষি থাকুক না কেন, নিজের কায়-কারবার ও আচার-ব্যবহারকে সে শরীয়াতের মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত হতে দেবে না। এ আদলেরই পরবর্তী জিনিস হচ্ছে ইহ্‌সান। এটি আদলের চাইতে বাড়তি একটা জিনিস।

ইহ্‌সান (সদাচরণ)

পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইহ্‌সানের গুরুত্ব আদলের চাইতেও বেশী। আদলকে যদি সম্পর্কের ভিত্তি বলা যায় তবে ইহ্‌সান হচ্ছে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। আদল যদি সম্পর্ককে অপ্রীতি ও তিক্ততা থেকে রক্ষা করে তবে ইহ্‌সান তাতে মাধুর্য ও সম্প্রীতির সৃষ্টি করে। বস্তুত প্রত্যেক পক্ষই কেবল সম্পর্কের ন্যূনতম মানটুকু পরিমাপ করে দেখতে থাকবে আর প্রাপ্যাধিকারে এতোটুকু কম ও অন্যের দেয়া অধিকারে এতোটুকু বেশী স্বীকার করবে না, নিছক এতোটুকু ভিত্তির ওপরই কোনো সম্পর্ক বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। এমন সাদাসিদা সম্পর্কের ফলে সংঘর্ষ হয়তো বাধবে না; কিন্তু ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, নৈতিকতা ও শুভাকাঙ্ক্ষার যে নিয়ামতগুলো জীবনে আনন্দ ও মাধুর্যের সৃষ্টি করে, তা থেকে সে বঞ্চিত হবে। কারণ এ নিয়ামতগুলো অর্জিত হয় ইহ্‌সান তথা সদাচরণ, অকৃপণ ব্যবহার, সহানভূতিশীলতা, শুভাকাঙ্ক্ষা, খোশমেজাজ, ক্ষমাশীলতা, পারস্পরিক শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, অন্যকে অধিকারের চাইতে বেশী দেয়া এবং নিজে অধিকারের চাইতে কম নিয়ে তুষ্ট থাকা ইত্যাকার গুণরাজি থেকে।

এই ইহসানের ধারণাও নয়টি বিষয় সমন্বিত হাদীসে তিনটি বিষয়কে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট করে তোলে ঃ

اَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ وَاُعْطِىْ مَنْ حَرَمَنِىْ وَاَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَنِىْ

'যে ব্যক্তি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, আমি তার সঙ্গে যুক্ত হবো; যে আমাকে (অধিকার থেকে) বঞ্চিত করবে, আমি তাকে (তার অধিকার) বুঝিয়ে দেবো এবং যে আমার ওপর যুলুম করবে আমি তাকে মার্জনা করে দেবো।' (সূরা রা'দ ঃ ২২)

অর্থাৎ চরিত্রের এ গুণটি দাবী করে যে, মানুষ শুধু তার ভাইয়ের ন্যায় ও পুণ্যের বদলা অধিকতর ন্যায় ও পুণ্যের দ্বারাই দেবে তাই নয়, বরং সে অন্যায় করলেও তার জবাব ন্যায়ের দ্বারাই দিবে।

وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

'তারা অন্যায় ও পাপকে ন্যায় ও পুণ্যের দ্বারা নিরসন করে থাকে।'
(সূরা কাসাস ঃ ৫৪)

৪. রহমত

এ চারটি গুণের পর পঞ্চম জিনিসটির জন্যে আমি 'রহমত' শব্দটি ব্যবহার করবো। অবশ্য এর জন্যে আরো বহু পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

আমি রহমত শব্দটি এজন্যে ব্যবহার করছি যে, খোদ আল্লাহ তায়ালাই মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র আঁকবার জন্যে এ শব্দটি বেছে নিয়েছেন। এটা তার অর্থের ব্যাপকতার দিকেই অংগুলি নির্দেশ করে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ط

'আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরে রহমশীল।' (সূরা ফাতহ ঃ ২৯)

এ গুণটিকে সঠিকভাবে বুঝবার জন্যে আমরা একে হৃদয়ের নম্রতা ও কোমলতা বলে উল্লেখ করতে পারি। এর ফলে ব্যক্তির আচরণে তার ভাইয়ের জন্যে গভীর ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি, দয়া-দরদ ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। তার দ্বারা তার ভাইয়ের মনে অনু পরিমাণ কষ্ট বা আঘাত লাগবার কল্পনাও তার পক্ষে বেদনাদায়ক ব্যাপার। এ রহমতের গুণই ব্যক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং সাধারণ লোকদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে। রাসূলের (সা) প্রধান গুণরাজির মধ্যে এটিকে

কুরআন একটি অন্যতম গুণ বলে উল্লেখ করেছে এবং দাওয়াত ও সংগঠনের ব্যাপারে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'নিঃসন্দেহে তোমাদের কাছে তোমাদের ভেতর থেকেই নবী এসেছেন। তোমরা কোনো কষ্ট পেলে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তোমাদের কল্যাণের জন্যে তিনি সর্বদা উদগ্রীব এবং মু'মিনের প্রতি অতীব দয়াশীল ও মেহেরবান।' (সূরা তাওবা ঃ ১২৮)

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে যে, আপনার হৃদয় যদি কোমল না হতো তাহলে লোকেরা কখনো আপনার কাছে ঘেঁষতো না। আর দিলের এ কোমলতা আল্লাহ্ তায়ালারই রহমত।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

'আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের জন্যে নরম দিল ও সহৃদয়বান হয়েছেন। যদি বদমেজাজী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তাহলে লোকেরা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো।' (আল ইমরান ঃ ১৫৯)

ঈমানের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতিই হচ্ছে প্রেম-প্রীতি। আর প্রেম-প্রীতি ও কঠিন হৃদয় কখনো একত্রিত হতে পারে না। তাই একজন মু'মিন যখন প্রেমিক হয়, তখন স্বভাবতই সে নম্র স্বভাবের হয়। নতুবা তার ঈমানে কোনো কল্যাণ নেই। এ সত্যের প্রতিই রাসূলে কারীম (সা) নিম্নরূপ আলোকপাত করেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ مَالَفٌ وَلَاخَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ

(احمد وبيهقى - ابوهريرة)

'মু'মিন হচ্ছে প্রেম ভালোবাসার উজ্জ্বল প্রতীক। যে ব্যক্তি না কাউকে ভালবাসে আর না কেউ তাকে ভালবাসে, তার ভেতর কোন কল্যাণ নেই।'

(আহমেদ ,বাইহাকী - আবু হুরাইরা রাঃ)

আর এ জন্যেই বলা হয়েছে ঃ

مَنْ يُّحْرَمُ الرِّفْقُ يُحْرَمُ الْخَيْرُ

'যে ব্যক্তি কোমল স্বভাব থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত।' (মুসলিম)

একথারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে এই ঃ

مَنْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَاوَالْاٰخِرَةِ

'যে ব্যক্তিকে নম্রস্বভাব থেকে তার অংশ দেয়া হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকেও তার অংশ দেয়া হয়েছে।' (শরহে সুন্নাহ - আয়েশা রাঃ)

একবার মহানবী (সা) তিনজন জান্নাতী লোকের ভেতর থেকে এক জনের কথা উল্লেখ করেন। লোকটি তার আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রতি অতীব দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল ছিলো।

رَحِيْمٌ رَفِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٍ وَّمُسْلِمٍ (مسلم)

বস্তুত যে ব্যক্তি দুনিয়ার মানুষের প্রতি রহম করে না, তার চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ নয়। কারণ আখিরাতে সে খোদার রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর বান্দাহদের প্রতি রহমত করে, তার জন্যে আল্লাহর রহমতও অনিবার্য হয়ে যায়। মুহাম্মদ (সা) তাই বলেছেন ঃ

لَاتُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّامِنْ شَقِىٍّ

'রহমত কারো থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় না, কেবল হতভাগ্য ছাড়া।'

আরো বলেছেন ঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ -اِرْحَمُوْامَنْ فِىالْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

'যারা রহম করে, রহমান তাদের প্রতি রহম করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করো, যেনো আসমানবাসী তোমাদের প্রতি রহম করেন।'

–(আবু-দাউদ, তিরমিয – ইবনে উমর রাঃ)

এ রহমত ও নম্রতারই দুটো ভিন্ন দিকের প্রকাশ ঘটে ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে। এ দুটো জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا -

'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম (স্নেহ) এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (তিরমিযী — ইবনে আব্বাস রাঃ)

একজন মুসলমান তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নম্রপ্রকৃতির হয়ে থাকে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার দিলকে খুশী রাখা, তাকে কষ্ট পেতে না দেয়া এবং তার প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। এ বিষয়টিকে রাসূলে কারীম (সা) নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়েছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيِّنُوْنَ كَالْجَمَلِ اِنْ قِيْدَ اِنْقَادَ وَاِنْ أُنِيْخَ عَلٰى صَخْرَةٍ اِسْتَنَاخَ

'মুমিন ব্যক্তি সেই উটের ন্যায় সহিষ্ণু ও সহৃদয় হয়ে থাকে, যার নাকে পতর পরিহিত, তাকে আকর্ষণ করলে আকৃষ্ট হয় আর পাথরের ওপর বসানো হলে বসে পড়ে।' – তিরমিযী

কুরআন মজীদ অত্যন্ত সংক্ষেপে এ সমগ্র বিষয়টি বর্ণনা করেছে ঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-

"তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়—নম্র হবে।" — সূরা মায়েদা ঃ ৫৪

প্রকৃত পক্ষে এ রহমতের গুণটিই মানবিক সম্পর্কের ভেতর নতুন প্রাণ-চেতনার সঞ্চার করে, তার সৌন্দর্য ও সৌকর্যকে পূর্ণত্ব দান করে। এক ব্যক্তি যদি একবার এ রহমতের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে, তবে তার দিলকে ঐ সম্পর্ক৷যার মাধ্যমে সে এ নিয়ামত লাভ করেছে৷ছিন্ন করার জন্যে সম্মত করানো খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে।

৫. মার্জনা (عَفُوٌّ)

মার্জনা অর্থ ক্ষমা করে দেয়া। অবশ্য এ অর্থের ভেতর থেকে পৃথক পৃথকভাবে অনেক বিষয় শামিল হয়ে থাকে। যেমন ক্রোধ-দমন, ধৈর্য-স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। কিন্তু এ গুণটির সাথে ওগুলোর যেহেতু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তাই ওগুলোকে আমরা এরই অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছি। যখন দু'জন লোকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন প্রত্যেকের দ্বারা স্বভাবতঃই এমন কিছু না কিছু ব্যাপার ঘটে যা অন্যের পক্ষে অপ্রীতিকর, তিক্ত, কষ্টদায়ক ও দুঃখজনক। এর কোনোটা তার মনে ক্রোধের সঞ্চার করে, আবার কোনো কোনোটা তাকে আইনসঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণেরও অধিকার দেয়। কিন্তু এমনি ধরনের পরিস্থিতিতে, ভালবাসাই বিজয়ী হোক, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে তারা বিরত থাকুক এবং তারা মার্জনা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অনুসরণ করুক——একটি প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক তার স্থিতিশীলতার জন্যে এটাই দাবী করে। এটা ছিলো রাসূলে কারীম (সা)-এর বিশেষ চরিত্রগুণ। এ জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে বহু জায়গায় নছিহত করেছেনঃ

خُذِ الْعَفْوَ -

"নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর।" —সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৯

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ -

আপনি তাদের ক্ষমা করে দাও, তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা কর।

আল ইমরান ঃ ১৫৯

মুসলমানদেরকে তাক্ওয়ার গুণাবলী শিখাতে গিয়ে এও বলা হয়েছে ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ -

যারা নিজেদের রাগকে সংবরন করেআর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে

আল ইমরান ঃ ১৩৪

কোনো মানুষ যখন কষ্ট পায় অথবা তার কোনো ক্ষতিসাধন হয়, তখন সর্বপ্রথম ক্রোধই তার মন-মগজকে আচ্ছন্ন করার প্রয়াস পায়। আর ক্রোধ যদি তার দিলকে–দিমাগকে অধিকার করতে পারে, তাহলে মার্জনা তো দূরের কথা, সে এমন সব অস্বাভাবিক কান্ড করে বসে যে, ভবিষ্যতে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্কের

আশাই তিরোহিত হয়ে যায়। এ কারণেই সর্বপ্রথম নিজের ক্রোধকে হজম করার বিষয়েই প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত। মানুষ যদি এ সম্পর্কে শান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করার অবকাশ পায় আর তারপর মার্জনার নীতি অনুসরণ নাও করে তবু অন্তত সে আদলের সীমা লংঘন করবে না। রাসূলে কারীম (সা) ক্রোধের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে একে দমন করবার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسَلَ

'নিশ্চয় ক্রোধ ঈমানকে এমনিভাবে নষ্ট করে দেয়, যেমন বিষাক্ত ওষুধ মধুকে নষ্ট করে।' (বায়হাকী)

مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ أَفْضَلُ عِنْدَاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا إِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যে ক্রোধের ঢোক গলাধঃকরণ করা হয়, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তার চাইতে কোনো শ্রেষ্ঠ ঢোক বান্দাহ্ গলাধঃকরণ করে না।'

(আহম্মদ — ইবনে উমর)

অনুরূপভাবে রাসূলে কারীম (সা) সবরের (ধৈর্য) শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, সম্পর্কচ্ছেদ করার চাইতে দুঃখ কষ্টে সবর অবলম্বন করা ও মিলেমিশে থাকাই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ আচরণ। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ خَالِطُ النَّاسِ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ اَفْضَلُ مِنْ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَايَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ ـ

'যে মুসলমান লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে সবর অবলম্বন করে, সে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তির মেলামেশা ছেড়ে দেয় এবং দুঃখ-কষ্টে সবর করে না।' (তিরমিযী, ইবনে মাজা— ইবনে উমর রাঃ)

একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে নছিহত করতে গিয়ে অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি বলেন ঃ

عَبْدًا ظُلِمَ بِظُلْمَةٍ فَيَغْضِىْ عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا اَمَرَ اللّٰهُ بِنَصْرِهٖ -

'কোন বান্দাহ্‌র ওপর যুলুম করা হলে সে যদি শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যেই নীরব থাকে তবে আল্লাহ্ তার বিরাট সাহায্য করেন।' –(বায়হাকি, আবু হুরায়রা)

সবরের পরবর্তী জিনিস হচ্ছে–বদলা ও প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপন ভাইকে হৃষ্টচিত্তে ক্ষমা করে দেয়া। নবী (সা) বলেছেন ঃ হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র কাছে জিজ্ঞেস করেন, বান্দাহর ভেতর কে তোমার কাছে প্রিয়। এর জবাবে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

مَنْ اِذَا قَدِرَ عَذَرَ -

'যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেয়।'

–(বায়হাকি, আবু হুরায়রা)

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ক্ষমা কবুল না করবে, তাকে নবী কারীম (স)-এ দুঃসংবাদ শুনিয়েছেন ঃ

مَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اَخِيْهِ فَلَمْ يَعْتَذِرْهُ اَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ -

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কাছে নিজ অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাইলো এবং সে তাকে ক্ষমা মনে করলো না অথবা তার ক্ষমা কবুল করলো না, তার এতখানি গোনাহ্ হল যতটা (একজন অবৈধ) শুল্ক আদায়কারীর হয়ে থাকে।'

(তিরমিযী —সাহল বিন মায়াজ)

আর যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার ভাইকে ক্ষমা করে দিলো তার জন্যে আখিরাতেও রয়েছে শ্রেষ্ঠতম প্রতিফল। তাই নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُّنَفِّذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ فِىْ اَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ۔

'যে ব্যক্তি ক্রোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে হযম করে ফেললো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডাকবেন এবং যে হুরকে ইচ্ছা তাকে মনোনীত করার এখতিয়ার দিবেন।' (তিরমিযী —সাহল বিন মায়াজ)

যারা দুনিয়ার জীবনে ক্ষমা করে দেবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন।

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

'তাদের ক্ষমা ও মার্জনার নীতি গ্রহণ করা উচিত। তোমরা কি পছন্দ করো না যে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিন? বস্তুত আল্লাহ্ মার্জনাকারী ও দয়া প্রদর্শনকারী।' (সূরা আন্ নূর—২২)

অবশ্য অন্যায়ের সমান অন্যায় দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়, তার প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র হাতে নিবদ্ধ।

وَجَزَاؤُ اسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا -فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ -اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰالِمِيْنَ۔

'অন্যায়ের বদলা সমান পরিমাণের অন্যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলো এবং আপোষ-রফা করলো, তার প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র কাছে; তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আশ্-শুরা : ৪০)

মার্জনার এ গুণটি অর্জন করা কোনো সহজ কাজ নয়। এ বড়ো সাহসের কাজ।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ

'যে ব্যক্তি সবর করলো এবং ক্ষমা করে দিলো তো এক বিরাট সাহসের কাজ (করলো)।' (সূরা আশ্-শুরা : ৪৩)

কিন্তু এ জিনিসটাই সম্পর্কের ভেতর অত্যন্ত মহত্ব ও পবিত্রতার সৃষ্টি করে। এ জন্যে এটা নিতান্তই একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

এ প্রসঙ্গে আরো দুটো গুণের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। একটি হচ্ছে পারস্পরিক আস্থা বা নির্ভরতা, আর দ্বিতীয়টি মূল্যোপলব্ধি।

৬. নির্ভরতা

নির্ভরতা পূর্ণাঙ্গ ধারণার মধ্যে বন্ধুত্ব শব্দটিও॥ কুরআন যাকে মুসলমানদের পারস্পরিক রূপ নির্ণয়ের জন্যে ব্যবহার করেছে॥ নিহিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য, যার কাছে মানুষ তার সমস্ত গোপন বিষয়াদি পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে প্রকাশ করতে পারে, তাকেই বলা হয় বন্ধু। আর মানুষ তার সঙ্গীর ওপর নির্ভর করবে এবং জীবনের তাবৎ বিষয়ে তাকে বরাবর শরীক করবে, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এটাই তো দাবী করে।

৭. মূল্যোপলব্ধি

এ সর্বশেষ জিনিসটির লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, মানুষ তার এ সম্পর্কের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে এতটুকু অবহিত হবে, যাতে করে এর সঠিক মূল্যটা সে উপলব্ধি করতে পারে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন মানুষ কোনোক্রমেই তার এ সম্পর্ক ছিন্ন করতে সম্মত হবে না।

তিন

সম্পর্ককে বিকৃতি থেকে রক্ষা করার উপায়

এ বুনিয়াদী নীতি ও গুণরাজির আলোকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) আমাদেরকে বিস্তৃত হিদায়াত প্রদান করেছেন, যাতে করে সম্পর্ককে অভীষ্ট মানে উন্নীত করা যায়। এর ভেতরে কতিপয় জিনিস হচ্ছে নেতিবাচক, এগুলো সম্পর্ককে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। আর কতিপয় বিষয় ইতিবাচক, এগুলো তাকে অধিকতর স্থিতি ও প্রীতির সঞ্চার করে।

সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান নিষিদ্ধ জিনিসটি হচ্ছে অধিকারে হস্তক্ষেপ।

১. অধিকারে হস্তক্ষেপ

এ বিশ্ব জাহানে প্রত্যেক মানুষেরই কিছুনা কিছু অধিকার রয়েছে। এ অধিকার যেমন মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্রে রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের প্রতি। একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, তার ভাইয়ের এ উভয়বিধ অধিকারের মধ্যে কোন একটি অধিকারও হরণ করার অপরাধে যাতে সে অপরাধী না হয়, তার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা। অর্থ-সম্পদ বা বস্তুগত স্বার্থের ভেতর তার ভাইয়ের যে অধিকার রয়েছে, তা যেমন সে হরণ করবে না, তেমনি তার জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ও দ্বীনের দিক থেকে তার প্রতি যে কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে, তা পালন করতেও সে বিরত থাকবে না। এ সমস্ত অধিকার সম্পর্কেই কুরআন সবিস্তারে আলোচনা করেছে। মীরাস, বিবাহ, তালাক এবং অন্যান্য প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহ্ তাঁর সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে সেগুলোতে হস্তক্ষেপ করার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিবরণ হাদীসে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু যে সকল জায়গায় এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে সেখানে

অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অধিকার ও খোদাভীতি সম্পর্কে নছিহত এবং নির্ধারিত সীমা লংঘনের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

'এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, অতএব একে লংঘন করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করে, সে-ই জালিম।' (সূরা বাকারা : ২২৯)

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ۔

'এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তাকে এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং সেখানে সে চিরকাল থাকবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) নাফরমানী করে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করে, আল্লাহ্ তাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে চিরদিন অবস্থান করবে এবং তার জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।'
(সূরা নিসা :১৩-১৪)

মহানবী (সা) এ কথাটি মুসলমানদের সামনে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ اِمْرَءٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔

'যে ব্যক্তি কসম খেয়ে কোনো মুসলমানের হক নষ্ট করেছে, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে তার প্রতি জাহান্নামকে অনিবার্য এবং জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন।'

সাহাবীদের ভেতর থেকে কেউ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَقَالَ اِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِّنْ اِرَاكٍ ـ

'তা যদি কোনো মামুলি জিনিস হয়? মহানবী বললেন ঃ হাঁ, তা যদি পীলো গাছের একটি অকেজো এবং মামুলি ডালও হয়, তবুও।'

একবার রাসূল (সা) অত্যন্ত মনোরম ভঙ্গিতে একথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَّا دِرْهَمَ لَهٗ وَلَامَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّاتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكٰوةٍ وَيَاتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَ اَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهٖ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهٗ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ـ

'দরিদ্র কে, জানো? সাহাবীগণ (সাধারণ অর্থের দৃষ্টিতে) বললেন ঃ যে ব্যক্তির মাল-মাত্তা নেই, সেই দরিদ্র। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে আসল দরিদ্র হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে কিয়ামাতের দিন নামাজ, রোজা ও জাকাতের ন্যায় আমল নিয়ে আসবে এবং সে সঙ্গে গালি দেয়া, কারুর ওপর অপবাদ দেয়া, কারুর মাল খাওয়া, কারুর রক্তপাত করা এবং কাউকে মারধর করার আমলও নিয়ে আসবে। অতঃপর একজন মজলুমকে তার নেকী দিয়ে দেয়া হবে। তারপর দেয়া হবে দ্বিতীয় মজলুমকে তার নেকী। এভাবে চূড়ান্ত ফায়সালার আগে তার নেকী যদি খতম হয়ে যায়, তাহলে হকদারদের পাপ এনে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তারপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম ; আবু হুরায়রা)

দুনিয়ার জীবনে সম্পর্ক-সম্বন্ধকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করা এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচবার জন্যে অধিকারের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রয়োজন। এ জন্যেই রাসূলে কারীম (সা) মৃত্যুর আগে মুসলমান ভাইদের কাছ থেকে নিজের দোষত্রুটি মাফ চেয়ে নেবার জন্যে বিশেষভাবে নছিহত করেছেন।

অধিকারের নিরাপত্তার ব্যাপারে প্রধান বুনিয়াদী জিনিস হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু তার ভাইয়ের হাত ও মুখ থেকে নিরাপদ থাকবে। এমন কি এ জিনিসটিকে রাসূলে কারীম (সা) একজন মুসলমানের আবশ্যকীয় গুণাবলীর মধ্যে শামিল করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ -

'মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে সমস্ত মুসলমান নিরাপদ।'
(বুখারী, মুসলিম ; আবদুল্লাহ-বিন-উমর)

২. দেহ ও প্রাণের নিরাপত্তা

প্রত্যেক মুসলমানের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান হচ্ছে তার দেহ ও প্রাণ। এ ব্যাপারে যে ব্যক্তি অন্যায়াচরণ করবে, তাকে সে কখনো নিজের ভাই বলে মনে করতে পারে না। তাই নাহক রক্তপাত থেকে মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا
فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّلَهٗ عَذَابًا
عَظِيْمًا -

'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার পুরস্কার হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি গযব ও লা'নত বর্ষণ করেছেন এবং তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন কঠোরতম শাস্তি।'
(সূরা নিসা : ৯৩)

বিদায় হজ্জের কালে হযরত রাসূল (সঃ) অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাষায় মুসলমানদের প্রতি পরস্পরের জানমাল ও ইজ্জত আব্রুকে সম্মানার্হ বলে ঘোষণা করেন এবং তারপর বলেনঃ 'দেখো, আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে যেয়োনা এবং পরস্পরের গলা কাটতে শুরু করো না।'

এভাবে একবার তিনি বলেন ঃ

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

'মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী আর তার সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে কুফরী।'
(বুখারী, মুসলিম)

হাতের চাইতে মুখের অপব্যবহার পারস্পরিক সম্পর্ককে অত্যন্ত নাজুক করে তোলে। এ জিনিসটি অসংখ্য দিক দিয়ে ফেতনার সৃষ্টি করতে থাকে। আর প্রত্যেকটি ফেতনাই এতো জটিল যে, তার নিরসন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এজন্যেই এ শ্রেণীর ফেতনার সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করাই সবচাইতে বেশী প্রয়োজন। তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) মুখের ব্যবহার সম্পর্কে যেমন অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তেমনি সম্পর্কের চৌহদ্দীর মধ্যে বিকৃতি ও বিপর্যয়ের প্রত্যেকটি কারণকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে প্রতিরোধ করার পন্থা বাতলে দিয়েছেন।

আল কুরআন মুসলমানদের বলছে ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

'তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না, কিন্তু তার কাছে হাজির রয়েছেন একজন নিয়ামক।' (সূরা ক্বফ : ১৮)

একদা রাসূলে কারীম (সা) হযরত মায়াজকে (রা) বিভিন্ন নছিহত করার পর নিজের জিহ্‌বা আঁকড়ে ধরে বলেন ঃ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا তোমার কর্তব্য হচ্ছে একে বিরত রাখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমরা যা কিছু বলা-বলি করি, সে সম্পর্কেও কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? তিনি বললেন ঃ

هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

'জবানের কামাই (অর্থাৎ ভাষা) ছাড়া আর কোন্ জিনিস মানুষকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করবে?' (তিরমিযী ; মু'য়াজ ইবনে জাবাল)

সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেনঃ 'নিজের ব্যাপারে কোন জিনিসটাকে সবচাইতে বেশী ভয় করবো?' রাসূল (সা) নিজের জিহ্বা ধরে বললেন ঃ 'একে'।

৩. কটু ভাষণ ও গালাগাল

কোনো ভাইকে সাক্ষাতে গালাগাল করা, তার সংগে কটু ভাষায় কথা বলা এবং তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অনুরূপভাবে বিকৃত নামে ডাকাও এর আওতায় এসে যায়। এ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ -

'আর বদনাম করোনা বিকৃত উপাধির সংগে, ঈমানের পর বিকৃত নামকরণ হচ্ছে বদকারী।' (সূরা হুজরাত : ১১)

অনুরূপভাবে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَلْجَوَاظُ الْجَعْظَرِىُّ -

'কোনো কটুভাষী ও বদ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (আবু দাউদ, বায়হাকী ; হারিস বিন ওয়াহাব)

اِنَّ اَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِّنِّىْ عَبَسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ الْمُتَفَيْهِقُوْنَ

'কিয়ামাতের দিন আমার দৃষ্টিতে সবচাইতে অভিশপ্ত এবং আমার থেকে সবচাইতে দূরে থাকবে বাচাল, অশ্লীলভাষী, ইলমের মিথ্যা দাবীদার ও অহংকারী ব্যক্তিগণ।' (তিরমিযী ; জাবির রা.)

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشَ وَلَا الْبَذِىَّ -

'মুমিন না বিদ্রূপকারী হয়, না লানত দানকারী, না অশ্লীলভাষী আর না বাচাল হয়।' (তিরমিযী ; ইবনে মাসউদ রা.)

মোটকথা, মুমিন তার ভাইয়ের সামনে তার মান ইজ্জতের ওপর কোনোরূপ হামলা করবে না।

৪. গীবত

অপর একটি ফেতনা হচ্ছে গীবত। এটা আগেরটির চেয়েও বেশী গুরুতর। কারণ এতে মানুষ তার ভাইয়ের সামনে নয় বরং তার পেছনে বসে নিন্দাবাদ করে। তাই কুরআন গীবতকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাবার সঙ্গে তুলনা করেছে ঃ

لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا - أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ

'কেউ কারো গীবত কর না। তোমরা কি কেউ আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? একে তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে।' (সূরা হুজরাত : ১২)

রাসূলে কারীম (সা) গীবতের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে একবার সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করেনঃ 'গীবত কি তা তোমরা জানো?'

সাহাবীগণ বলেন ঃ 'আল্লাহ্ এবং রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন ঃ

ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ فَقِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ـ

'গীবত হচ্ছে এই যে, তোমার ভাইয়ের পছন্দনীয় নয়, এমনভাবে তার চর্চা করা। বলা হলো, আমার ভাইয়ের মধ্যে যদি উল্লেখিত খারাবী বর্তমান থাকে? রাসূল (সা) বললেনঃ তোমরা যদি এমন খারাবীর কথা উল্লেখ করো, যা তার মধ্যে বর্তমান রয়েছে, তবে তো গীবত করলে। আর তার মধ্যে যদি তা বর্তমান না থাকে তো তার ওপর অপবাদ চাপিয়ে দিলে।' (মসিুলম ; আবু হুরায়রা রা.)

বস্তুত একজন মুসলিম ভাইয়ের মান-ইজ্জত দাবী করে যে, তার ভাই যেনো পেছনে বসে নিন্দাবাদ না করে।

৫. চোগলখুরী

গীবতের একটি বিশেষ রূপ হচ্ছে চোগলখুরী। অল কুরআন এর নিন্দা করতে গিয়ে বলেছে ঃ

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيمٍ -

'যারা লোকদের প্রতি বিদ্রুপ প্রদর্শন করে এবং চোগলখুরী করে বেড়ায়।'

(সূরা কালাম ; ১১)

হযরত হোজায়ফা (রা) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি যে, চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। রাসূলে কারীম (সা) সঙ্গীদেরকে বিশেষভাবে নছিহত করে বলেন ঃ

لَايُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِىْ شَيْئًا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ -

'কোনো ব্যক্তি কারো সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা আমার কাছে পৌছাবে না, কারণ আমি যখন তোমাদের কাছে আসি, তখন সবার প্রতিই আমার মন পরিষ্কার থাকুক- এটাই আমি পছন্দ করি।' (আবু দাউদ ; ইবনে মাসউদ রা.)

গীবত ও চোগলখুরীর মধ্যে মুখের জবান ছাড়াও হাত, পা ও চোখের সাহায্যে দুস্কৃতি করাও অন্তর্ভুক্ত।

৬. শরমিন্দা করা

দুস্কৃতিরই একটি গুরুতর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং মানব মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী রূপ হচ্ছে – আপন ভাইকে তার সাক্ষাতে বা অন্য লোকের সামনে তার দোষ-ক্রুটির জন্যে লজ্জা দেয়া এবং এভাবে তার অবমাননা করা। এমন আচরণের ফলে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। কারণ এমনি অবমাননা কোনো মানুষই সহ্য করতে পারে না।

আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ

' আপন ভাইয়ের প্রতি দোষারোপ করো না।' (সুরা হুজরাত : ১১)

একটি হাদীসে রাসূলে কারীম (সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোনো গুনাহ্‌র জন্যে লজ্জা দিলো তার দ্বারা সেই গুনাহ্‌র কাজ না হওয়া পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না।

مَنْ غَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ ـ

হযরত ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত (সা) মুসলমানদের কতিপয় কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ 'তাদেরকে কোনো দোষ বা গোনাহ্‌র লক্ষ্য বানিয়ে শরমিন্দা ও অপমানিত করো না।'(তিরমিযী)

৭. ছিদ্রান্বেষণ

দোষারোপ করে শরমিন্দা করার আগে আর একটি খারাপ কাজ রয়েছে। তা হচ্ছে, আপন ভাইয়ের দোষ খুঁজে বেড়ানো, তার ছিদ্রান্বেষণ করা। কারণ, যার ছিদ্রান্বেষণ করা হয় সে যেন অপ্রতিভূ হয়, তার দোষত্রুটি যার গোচরীভূত হয়, তার মনেও বিরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। যেহেতু ছিদ্রান্বেষণ কোন নির্ভরযোগ্য অন্বেষণ উপায়ের ধার ধারে না, এজন্যেই সাধারণত বাজে অন্বেষণ-উপায়ের উপর নির্ভর করে আপন ভাই সম্পর্কে বিরূপ ধারণা তথা সন্দেহ পোষণের মতো গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হবার সম্ভাবনাই থাকে বেশী। এ জন্যেই আল কুরআন বিরূপ ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের বলেছে ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوْا

'আর দোষ খুজে বেড়িয়ো না।' (সূরা হুজরাত : ১২)

নবী কারীম (সা) ও এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ يَّتَّبِعُ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَّتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَه يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِىْ جَوْفِ رَحْلِهِ ـ

'মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ ও গুনাহ্ খুঁজতে থাকে, আল্লাহ্ তার গোপন দোষ ফাঁস করতে লেগে যান। আর আল্লাহ্ যার দোষ প্রকাশ করতে লেগে যান, তাকে তিনি অপমান করেই ছাড়েন–সে তার ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকুক না কেন।'

(তিরমিযী ; আবদুল্লাহ ইবনে উমর)

৮. উপহাস করা

জবানের দুস্কৃতির মধ্যে আর একটি মারাত্মক দুস্কৃতি–যা এক ভাই থেকে অন্য ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়–তা হচ্ছে ঠাট্টা বা উপহাস করা। অর্থাৎ আপন ভাইকে এমনিভাবে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, যার মধ্যে হেয় প্রতিপন্নের সুর মিশ্রিত রয়েছে, বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করারই ফল হচ্ছে উপহাস। তাই আল কুরআন এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভাষায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ -

'হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় অপর কোনো সম্প্রদায়কে ঠাট্টা করোনা, সম্ভবতঃ সে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হবে। আর কোনো নারী অপর কোনো নারীকে ঠাট্টা করো না, সম্ভবত সে শ্রেষ্ঠ হবে তার চাইতে।' (সুরা হুজরাত : ১১)

যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইকে উপহাস করে, আখিরাতে তার ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা) নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

اِنَّ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ بِالنَّاسِ يُفْتَحُ لِاَحَدِهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَابٌ مِّنَ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهٗ هَلُمَّ فَيَجِئُ بِكَرْبِهٖ وَغَمِّهٖ فَاِذَا جَاءَهٗ اُغْلِقَ دُوْنَهٗ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهٗ بَابٌ اٰخَرُ فَيُقَالُ لَهٗ هَلُمَّ فَيَجِئُ بِكَرْبِهٖ وَغَمِّهٖ فَاِذَا جَاءَهٗ اُغْلِقَ دُوْنَهٗ فَمَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهٗ هَلُمَّ فَمَا يَاْتِيْهِ مِنَ الْيَاْسِ -

'লোকদের প্রতি বিদ্রুপ প্রদর্শনকারী ব্যক্তির জন্যে কিয়ামতের দিন জান্নাতের একটি দরজা খোলা হবে। এবং তাকে বলা হবে, 'ভেতরে আসুন।' সে কষ্ট করে সেদিকে আসবে এবং দরজা পর্যন্ত পৌছতেই তার সামনে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। অতপর দ্বিতীয় দরজা খুলে বলা হবে, 'আসুন' 'বসুন'। সে আবার কষ্ট করে

আসবে, যেইমাত্র সে কাছাকাছি পৌঁছবে অমনি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। এ ঘটনা পরম্পরা এমনিভাবেই অব্যাহত থাকবে। এমনকি এক সময় তার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে বলা হবে, 'আসুন'। তখন সে নৈরাশ্যের কারণে সেদিকে যেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে সাহসই পাবে না।' (বায়হাকী)

উপহাসের একটি রূপ হচ্ছে, অন্য লোকের দোষক্রুটি নিয়ে ব্যঙ্গ করা। একবার হযরত আয়িশা (রা) কারো ব্যঙ্গ করলে রাসূল (সা) অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ

مَا اُحِبُّ اَنِّى حُكِيْتُ اَحَدًا وَاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا ۔

'আমি কারুর ব্যাংগ করাকে পছন্দ করি না–তার বিনিময়ে আমাকে অমুক অমুক জিনিস দেয়া হোক না কেন (অর্থাৎ যে কোনো দুনিয়াবী নিয়ামত)।'

(তিরমিযী; আয়েশা রা.)

৯. তুচ্ছ জ্ঞান করা

যে বস্তুটি মনের ভেতর চাপা থাকে এবং বাহ্যত তা গালি দেয়া, লজ্জা দেয়া, গীবত করা, চোগলখুরী করা ও উপহাস করার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে আপন ভাইকে নিজের চাইতে তুচ্ছ জ্ঞান করা। বস্তুত এমনি উচ্চমন্যোতাবোধ সৃষ্টির পরই মানুষ তার ভাই সম্পর্কে এ শ্রেণীর আচরণ করার সাহস পায়। নচেৎ আপন ভাইকে যে ব্যক্তি নিজের চাইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করবে, সে কখনো এ ধরনের কাজ করতে পারে না। এজন্যেই আল কুরআন উপহাস থেকে বিরত রাখার সময় এ মর্মে ইংগিত প্রদান করেছে যে, মানুষ যদি চিন্তা করে দেখে যে, তার ভাই তার চাইতে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, তবে সে কখনো তাকে বিদ্রুপ করবে না।

عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

"হতে পারে সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম।" (সুরা হুজরাত ঃ ১১)

সাহাবীদের ভেতর থেকে কেউ জিজ্ঞেস করলেন — ঈমান ও তাকওয়ার সাথে একজন মু'মিন ও মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান অথবা তার সম্পর্কে নীচ ও নিকৃষ্ট ধারণায় কখনো একত্রিত হতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির মান-সম্ভ্রমের মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া এবং এর প্রকৃত মীমাংসা হবে আখিরাতে আল্লাহ্র দরবারে। সুতরাং দুনিয়ায় আপন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মানেই হচ্ছে সে ব্যক্তি

ঈমানের প্রকৃত মূল্যমানকে এখনো বুঝতে পারে নি। একবার রাসূলে কারীম (সা) এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ হাদীসে তাকওয়াকে অন্তরের জিনিস আখ্যা দিয়ে বলেন ঃ

بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ -

'এক ব্যক্তির গুনাহ্গার হবার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে নীচ জ্ঞান করে।' (মুসলিম; আবু হুরায়রা রা.)

অপর একটি বর্ণনায় রাসূল (সা) এমনিভাবে বলেন ঃ

وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ

'কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে না অপমান করবে আর না তুচ্ছ জ্ঞান করবে।'

একদা রাসূল (সা) বলেন যে, যার দিলে অনুপরিমাণও অহংকার تعد থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে তিনি অহংকারের ব্যাখ্যা দান করে বলেন ঃ

بَطْرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ -

'অহংকার বলতে বুঝায় সত্যকে অস্বীকার এবং লোকদের নীচ জ্ঞান করা।' (মুসলিম ; ইবনে মাসউদ রা.)

একটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) তিনটি নাজাতদানকারী এবং তিনটি ধ্বংসকারী বিষয় উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِىَ اَشَدُّهُنَّ -

'একটি ধ্বংসকারী জিনিস হচ্ছে নিজেকে নিজে বুজুর্গ ও শ্রেষ্ঠতম মনে করা আর এটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম অভ্যাস।' (বায়হাকী ; আবু হুরায়রা রা.)

আজকের সমাজ-পরিবেশে শুধু নিজেদের বন্ধু-সহকর্মীদের সংগেই নয়, বরং সাধারণ মুসলমানদের সাথে আচরণের বেলায়ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এদিক দিয়ে আত্মানুশীলন করা উচিত।

১০. নিকৃষ্ট অনুমান

অনুমানের ব্যাধি এক গুরুতর ব্যাধি। এ ব্যাধি পারস্পরিক সম্পর্কে ঘুণ ধরিয়ে দেয় এবং তাকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলে। প্রচলিত অর্থে অনুমান বলতে বুঝায় এমনি ধারণাকে, যার পেছনে কোনো স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। আর এমনি ধারণা যখন নিকৃষ্ট হয়, তখন তাকেই বলা হয় সন্দেহ। কোনো মুসলমান যদি তার ভাই সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়াই সন্দেহ করতে শুরু করে, তবে সেখান থেকে প্রেম-ভালবাসা বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য। তাই আল কুরআন এ সম্পর্কে বলেছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

'হে ঈমানদারগণ, বহুঅনুমান থেকে তোমরা বেঁচে থাকো, নিঃসন্দেহে কোনো-কোনো অনুমান হচ্ছে গুনাহ্।' (সুরা হুজরাতঃ ১২)

রাসূল (সা) তাঁর সংগীদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ ـ

'তোমরা অনুমান পরিহার করো, কেননা অনুমান হচ্ছে নিকৃষ্টতম মিথ্যা কথা।'
(বুখারী, মুসলিম; আবু হুরায়রা রা.)

অনুমান সন্দেহ থেকে বাঁচার সবচাইতে বড়ো উপায় হলো এই যে, মানুষ তার ভাইয়ের নিয়্যাত সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করবে না, কোনো খারাপ মন্তব্যও করবে না। কারণ নিয়্যাত এমনি জিনিস যে, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সর্বদাই অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা সামনে রাখলে সহজেই এ ব্যাধিটির প্রতিকার করা সম্ভব হবে।

প্রথম কথা এই যে, আপন ভাই সম্পর্কে অনুমান বা সন্দেহ পোষণ না করা যেমন প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তেমনি নিজের সম্পর্কে অপরকে সন্দেহ পোষণের সুযোগ না দেয়াও তার কর্তব্য। তাই সন্দেহের সুযোগ দানকারী বিষয়কে যতদুর সম্ভব পরিহার করতে হবে। অপরকে কোনো অবস্থায়ই ফেতনায় ফেলা উচিত নয়, এ সম্পর্কে স্বয়ং নবী কারীম (সা) দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন একবার তিনি

ইতেকাফে বসেছিলেন। রাতে তাঁর জনৈকা স্ত্রী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন। ফিরতি পথে তিনি তাঁকে এগিয়ে দিতে চললেন। ঘটনাক্রমে দু'জন আনসারের সংগে তাঁর দেখা হলো। তারা তাঁকে স্ত্রীলোকের সংগে দেখে নিজেদের আগমনকে 'অসময়' মনে করে ফিরে চললেন। অমনি তিনি তাদেরকে ডেকে বললেনঃ 'শোনো, এ হচ্ছে আমার অমুক স্ত্রী।' আনসারদ্বয় বললেনঃ 'ইয়া রাসুলাল্লাহ্! কারো প্রতি যদি আমাদের সন্দেহ পোষণ করতেই হতো তবে কি আপনার প্রতি করতাম?' তিনি বললেনঃ 'শয়তান মানুষের ভেতর রক্তের ন্যায় ছুটে থাকে।'

দ্বিতীয়ত ঃ যদি এড়াবার চেষ্টা সত্বেও সন্দেহের সৃষ্টি হয়ই, তবে তাকে মনের মধ্যে চেপে রাখবে না। কারণ মনের মধ্যে সন্দেহ চেপে রাখা খিয়ানতের শামিল। বরং অবিলম্বে গিয়ে নিজের ভাইয়ের কাছে তা প্রকাশ করবে, যাতে করে সে তার নিরসন করতে পারে। অপরদিকে যার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হবে, সে চুপচাপ বসে না থেকে সংগে সংগেই তার অপনোদন করবে। নচেৎ এ গুনাহ্‌র অনেকখানি তার নিজের ঘাড়েও চাপতে পারে।

১১. অপবাদ

জেনে-শুনে নিজের ভাইকে অপরাধী ভাবা অথবা তার প্রতি কোনো অকৃত গুনাহ্‌, আরোপ করাকে বলা হয় অপবাদ। এটা স্পষ্টত এক ধরনের মিথ্যা ও খিয়ানত। এ অপবাদেরই আর একটি নিকৃষ্টতর রূপ হচ্ছে নিজের গুনাহকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। এ সম্পর্কে আল কুরআন বলেছে ঃ

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا ـ

'যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ বা নাফরমানী করলো এবং তারপর এক নিরপরাধ ব্যক্তির ওপর তার অপবাদ আরোপ করলো, সে এক মহাক্ষতি এবং স্পষ্ট গুনাহ্‌কেই নিজের মাথায় চাপিয়ে নিলো।' (সুরা নিসা : ১১২)

এভাবে মুসলমানদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

'যারা মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে কষ্ট দেয়, তারা আপন মাথায় 'বুহ্তান' ও স্পষ্ট গুনাহ্ চাপিয়ে নিলো।' (সূরা আহ্যাব : ৫৮)

বস্তুত একটি ভালোবাসার সম্পর্কে এমন আচরণের কতোখানি অবকাশ থাকতে পারে?

১২. ক্ষতিসাধন

ক্ষতি শব্দটিও অত্যন্ত ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এখানে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কোনো মুসলমানের দ্বারা তার ভাইয়ের যাতে কোনো ক্ষতিসাধন না হয়, এরপ্রতি সে লক্ষ্য রাখবে। এ ক্ষতি দৈহিকও হতে পারে, মানসিকও হতে পারে। এ সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন ঃ

مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَبِهٖ ـ

'যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের ক্ষতি সাধন করে অথবা কারো সংগে ধোকাবাজী করে, সে হচ্ছে অভিশপ্ত।' (তিরমিযী ; আবু বকর সিদ্দীক রা.)

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ بِهٖ ـ

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ক্ষতিসাধন করলো, আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিলো আল্লাহ্ তাকে কষ্ট দিবেন।'
(ইবনে মাযা, তিরমিযী)

১৩. মনোকষ্ট

কোনো মুসলমানের পক্ষে তার ভাইয়ের মনে কষ্ট দেয়া নিশ্চিতরূপে এক অবাঞ্ছিত কাজ। এমন কাজকে তার আদৌ প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। এক ভাইয়ের মন অন্য ভাইয়ের দ্বারা কয়েকটি কারণে কষ্ট পেতে পারে। এ সম্পর্কিত বড় বড় কারণগুলো

ছাড়াও জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে মানুষের মেজাজ ও প্রকাশভংগীও মনোকষ্টের একটা কারণ হতে পারে। এ ব্যাপারে নীতিগত কথা এই যে, কোনো মুসলমানের দ্বারা তার ভাইয়ের মন যাতে কষ্ট না পায় অথবা তার অনুভূতিতে আঘাত না লাগে, তার জন্যে তার চেষ্টা করা উচিত।

গীবতের মতো গুরুতর অপরাধেরও ভিত্তি হচ্ছে এটি। তাই গীবতের সংজ্ঞা হচ্ছে এই যে, কারো সম্পর্কে এমনি আলোচনা করা, যা তার কাছে পছন্দনীয় নয় অথবা তার মনোকষ্টের কারণ হতে পারে।

রাসূলে কারীম (সা) বলেছেনঃ 'যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে, তখন দু'জনে কোনো কানালাপ করবে না। অবশ্য অনেক লোক যদি জমায়েত হয়, তবে এমন করা যেতে পারে। এই হুকুমের যে কারণ বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই ঃ

مِنْ اَجْلِ اَنْ يُّحْزِنَهٗ ـ

'এই ভয়ে যে, সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।' (মুসলিম; আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ)

ইসলামের দেয়া এ নিয়ম-কানুনগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যাবে যে, কোনো মুসলমান ভাইয়ের মনে কষ্ট না দেয়া এর পেছনে একটি বুনিয়াদী নীতি হিসেবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। মুসলমানকে কষ্ট দেয়া দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত অন্যায়। তাই এ সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ ـ

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে কষ্ট দিলো, সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল।'
(তিরমিযী; আনাস রা.)

পক্ষান্তরে কারো মনকে খুশী করার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা হলে সে সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঃ

مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ مِّنْ اُمَّتِىْ حَاجَةً يُّرِيْدُ اَنْ يَّسُرَّهٗ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِىْ وَمَنْ سَرَّنِىْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ ـ

'যে ব্যক্তি আমার কোনো উম্মতকে খুশী করার উদ্দেশ্যে তার প্রয়োজন পূর্ণ করলো, সে আমাকেই খুশী করলো। যে আমাকে খুশী করলো, সে আল্লাহকেই খুশী করলো। আর যে আল্লাহ্‌কে খুশী করলো, আল্লাহ্‌ তাকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন।' (বায়হাকী ; আনাস রা.)

এখানে রাসূলে কারীম (সা)এর এ কথাটিও স্মর্তব্য ঃ 'মুমিন হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসার উজ্জ্বল প্রতীক। যে ব্যক্তি কারো প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে না এবং তার প্রতিও কেউ ভালোবাসা রাখে না, তার ভেতর কল্যাণ নেই।'

মনোকষ্ট সাধারণত হাসি-তামাসার মাধ্যমে উত্যক্ত করার ফলেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ এমনভাবে হাসি তামাসা করা, যাতে অপর ব্যক্তি বিব্রত হয় এবং তার মনে কষ্ট লাগে।

একবার সাহাবীগণ রাসূল (সা)-এর সংগে সফর করছিলেন। পথে এক জায়গায় কাফেলার রাত্রিযাপনকালে এক ব্যক্তি তার অপর এক ঘুমন্ত সংগীর রশি তুলে নিলো এবং এভাবে তাকে বিব্রত করলো। এ কথা জানতে পেরে রাসূলে কারীম (সা) বললেন ঃ

لَايَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يُّرَوِّعَ مُسْلِمًا ـ

'কোনো মুসলমানকে হাসি-তামাসার মাধ্যমে উত্যক্ত করা মুসলমানের পক্ষে হালাল নয়।' (আহম্মদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী ; আবদুর রহমান রা.)

অনুরূপভাবে একবার অস্ত্র গোপন করার এক ঘটনা ঘটলে রাসূল (সা) এই বলে নিষেধ করলেনঃ

اَنْ يُّرَوِّعَ الْمُؤْمِنَ اَوْ اَنْ يُّؤْخَذَ مَتَاعَهُ لَاَلَعِبًا وَّلَا جِدًّا ـ

'কোনো মুমিনকে ভয় দেখানো এবং হাসি-তামাসা করে অথবা বাস্তবিক পক্ষে কারো কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়া জায়েয নয়।'

১৪. ধোঁকা দেয়া

কথাবার্তা বা লেনদেনে আপন ভাইকে ধোঁকা দেয়া বা মিথ্যা কথা বলা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। কারণ যেখানে এক পক্ষ অন্য পক্ষের সংগে এমনি আচরণ করতে পারে, সেখানে কখনো একজন অপরজনের ওপর নির্ভর করতে পারে না। আর যেখানে এক ব্যক্তির কথা অপর ব্যক্তির পক্ষে নির্ভরযোগ্য নয় সেখানে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও পারস্পরিক আস্থা কিছুতেই বর্তমান থাকতে পারে না। হাদীস শরীফে এ জিনিসটাকেই 'নিকৃষ্টতম খিয়ানত' বলে অভি-হিত করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

قَالَ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَلَكَ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ -

'সব চাইতে বড় খিয়ানত হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার ভাইকে কোনো কথা বললে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করলো; অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথা বললে।'
(তিরমিযী; সুফিয়ান বিন আসাদ)

১৫. হিংসা

হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা এক ঘৃণ্য ব্যাধি। এ ব্যাধিটা যদি মানুষের মনে একবার ঠাঁই পায় তাহলে আন্তরিক সম্পর্কই শুধু ছিন্ন হয় না, লোকদের ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়ে। হিংসার সংজ্ঞা এই যে, কোনো মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালার দেয়া কোনো নেয়ামত, যেমন ধনদৌলত, জ্ঞান-বুদ্ধি বা সৌন্দর্য সুষমাকে পছন্দ না করা এবং তার থেকে এ নিয়ামতগুলো ছিনিয়ে নেয়া হউক, মনে প্রাণে এটা কামনা করা। হিংসার ভেতর নিজের জন্যে নিয়ামতের আকাঙ্খার চাইতে অন্যের থেকে ছিনিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষাটাই প্রবল থাকে।

হিংসার মূলে থাকে কখনো বিদ্বেষ ও শত্রুতা কখনো ব্যক্তিগত অহমিকা ও অপরের সম্পর্কে হীনমন্যতাবোধ, কখনো অন্যকে অনুগত বানানোর প্রেরণা, কখনো কোনো সম্মিলিত কাজে নিজের ব্যর্থতা ও অপরের সাফল্য লাভ, আবার কখনো শুধু মান

ইজ্জত লাভের আকাঙ্ক্ষাই এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হিংসা সম্পর্কে নবী কারীম (সা) এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ

'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, আগুন যেমন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে, হিংসা ঠিক তেমনি নেকী ও পুণ্যকে খেয়ে ফেলে।' (আবু দাউদ ; আবু হুরায়রা রা.)

আর এ জিনিসটি থেকেই আল কুরআন প্রত্যেক মুসলমানকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছে ঃ

مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ـ

'এবং (আমি আশ্রয় চাই) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সুরা ফালাক ঃ ৫

একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসে নবী কারীম (সা) ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের জন্যে পরিহার্য কতকগুলো বিষয়ের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেছেন। উক্ত হাদীসের এক অংশে নিকৃষ্ট অনুমান প্রসংগে উল্লেখিত হয়েছে। বাকী অংশে রাসূলে (সা) বলেন ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَاتَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا ـ

'কারো দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না, কারো ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষতি করো না, পরস্পরে হিংসা-দ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর শত্রুতা রেখো না, পরস্পর সম্পর্কহীন থেকো না, পরস্পরে লোভ-লালসা করো না বরং আল্লাহর বান্দাহ্ ও ভাই-ভাই হয়ে থাকো।' (বুখারী, মুসলিম ; আবু হুরায়রা রা.)

হাদীসের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানীএর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ 'এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তোমরা যখন এ নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন

করবে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভাই-ভাই হয়ে যাবে।' উপরন্তু এ হিংসা ও শত্রুতা সম্পর্কে রাসূল (সা) এও বলেছেন ঃ

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

'পূর্বেকার উম্মতদের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আর এ ব্যাধি হচ্ছে হিংসা ও শত্রুতা—যা মুণ্ডন করে দেয়। আবশ্য চুল মুণ্ডন করে দেয়া একথা আমি বলছি না, বরং দ্বীনকে মুণ্ডন করে দেয়।' (আহমদ, তিরমিযী)

চার

সম্পর্ক দৃঢ়তর করার পন্থা

সম্পর্কের বিকৃতি ও অনিষ্টসাধনকারী এ জিনিসগুলো থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গে যেগুলো গ্রহণ ও অনুসরণ করার ফলে সম্পর্ক দৃঢ়তর ও স্থিতিশীল হয়, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং যার ফলে দুটো হৃদয়ের মধ্যে এক হাতের দু'টি অংগুলির মতোই ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) সেগুলোও আমাদেরকে সুনির্দিষ্টরূপে বলে দিয়েছেন। এর ভেতর কতকগুলো জিনিসকে অত্যাবশ্যকীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অথবা বলা যায়, সেগুলোকে অধিকার (হক) হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার কতকগুলো জিনিসের জন্যে করা হয়েছে নছিহত। এগুলো হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের পর্যায়ভুক্ত। ইতিপূর্বে চরিত্রের যে বুনিয়াদী গুণরাজির কথা বিবৃত করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাই হচ্ছে অধিকার ও মহত্বের প্রাণবস্তু স্বরূপ, তবে তার প্রতিটি জিনিসকেই আলাদাভাবে সামনে রাখা দরকার। কারণ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ককে বিকশিত এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত করার জন্যে এর প্রতিটি জিনিসই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১. মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা

একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে তার মান-ইজ্জত। নিজের মান-ইজ্জতকে বরবাদ করতে সে কিছুতেই সম্মত হতে পারে না। তাই একদিকে যেমন মুসলমানকে তার ভাইয়ের ইজ্জতের ওপর হামলা করতে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আপন ভাইয়ের ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করার জন্যেও বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে এবং একে একটি পরম কর্তব্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যদি ভাইকে কোথাও গালাগাল করা হয়, তার ওপর মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয়া হয়, তবে তাকে নিজের ইজ্জতের ওপর হামলা মনে করে তার মোকাবেলা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। নিজের ইজ্জত বরবাদ হলে তার যতোখানি মনোকষ্ট হয়, এক্ষেত্রেও তার ততোটাই হওয়া উচিত। একজন মুসলমানের যদি

একথা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস হয় যে, তার মান-ইজ্জত তার মুসলমান ভাইয়ের হাতে নিরাপদ, তবে তার ভাইয়ের সংগে অবশ্যই এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কিন্তু একথাও যদি তার নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস হয় যে, সে তার সামনে অথবা পেছনে নিজের ইজ্জতের মতোই তার ইজ্জতের সংরক্ষণ করে তবে তার দিলে কতোখানি প্রগাঢ় ভালবাসার সৃষ্টি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এজন্যেই নবী কারীম (সা) বেশুমার হাদীসে এ বিষয়টির নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

مَامِنْ اِمْرَءٍ مُّسْلِمٍ يَخْذُلُ اِمْرَأً مُّسْلِمًا فِىْ مَوْضَعٍ يَنْتَهِكُ فِيْهِ حُرْمَتَهٗ وَيَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطَنٍ يُّحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهٗ وَمَا مِنْ اِمْرِئٍ يَّنْصُرُ مُسْلِمًا فِىْ مَوْضَعٍ يَّنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ وَيَنْتَهِكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهٖ اِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطَنٍ يُّحِبُّ نُصْرَتَهٗ ـ

'যদি কোথাও কোনো মুসলমানের অমর্যাদা বা ইজ্জতহানি করা হয় এবং সেখানে তার সাহায্য ও সহায়তা করতে কোনো মুসলমান বিরত থাকে, তবে এমনিতরো নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ও তার সাহায্যকে সংকুচিত করে দেন। অথচ তিনি চান যে, কেউ তার সাহায্য ও সহায়তার জন্যে এগিয়ে আসুক। আর কোথাও কোনো মুসলমানের অবমাননা ও মর্যাদাহানি হলে কোনো মুসলমান যদি তার সাহায্যের জন্যে দণ্ডায়মান হয় তো আল্লাহ্ও এমনি অবস্থায় তার সাহায্য ও সহায়তা করে থাকেন। কেননা তিনি চান যে, কেউ তার সাহায্য করুক।' (আবু দাউদ ; যাবির রা.)

আল্লাহ্র সবচেয়ে বড়ো সাহায্য হচ্ছে এই যে, তিনি দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। তাই রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

مَامِنْ مُّسْلِمٍ يَّرُدُّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ –

'যে মুসলমান তার মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জতহানি থেকে কাউকে বিরত রাখবে, আল্লাহর প্রতি তার অধিকার এই যে, তিনি জাহান্নামের আগুনকে তার থেকে বিরত রাখবেন। অতঃপর রাসূল (সা) এ আয়াত পড়লেনঃ 'মুষলমানদের সাহায্য করা আমাদের প্রতি এক কর্তব্য বিশেষ।' (শারহুস সুন্নাহ ; আবু দারদা)

মর্যাদাহানির একটি সাধারণ রূপ হচ্ছে গীবত। এর পরিচয় ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন ঃ

مَنْ اُغْتِيْبَ عِنْدَهُ اَخُوْهُ الْمُسْلِمَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاِنْ لَّمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ اَخَذَهُ اللّٰهُ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

'যে ব্যক্তির সামনে তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা হবে, সে যদি তার সাহায্য করার মতো সামর্থবান হয় এবং তার সাহায্য করে, তবে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ তার সাহায্য করবেন। আর যদি সাহায্য করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার সাহায্য না করে, তো দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করবেন।'
(শারহুস সুন্নাহ ; আনাস রা.)

আপন ভাইকে অন্যের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ حَمِىَ مُؤْمِنًا مِّنْ مُنَافِقٍ اَرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِىْ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَّارِ جَهَنَّمَ -

'যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে মুনাফেক (এর অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবে, তার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা এমন একজন ফিরেশতা নিযুক্ত করবেন, যে তার গোশতকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ রাখবে।' (আবু দাউদ)

একজন মুসলমানের প্রতি তার ভাইয়ের সাহায্যের ব্যাপারে বহু রকমের কর্তব্য আরোপিত হয়। যেমন–আর্থিক সাহায্য, অসুবিধা দূর করা, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এছাড়াও অসংখ্য প্রকারের দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজন পুর্ণ করা। এ জিনিসগুলো

আইনের চৌহদ্দীর বাইরে ইহ্সানের সাথে সম্পৃক্ত। তবু এগুলো জরুরি জিনিস এবং আখিরাতে এ সম্পর্কে জবাবদিহিও করতে হবে–যদিও এগুলো সম্পর্কে কোনো আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর নয়। একজন মুসলমান যদি অপর মুসলমানের পেট ভরাতে পারে, তার নগ্নদেহ ঢাকতে পারে, তার বিপদ-মুছিবত দূর করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তার আর্থিক অনটন দূর করতে পারে— তবে এগুলো করাই হচ্ছে তার প্রতি তার ভাইয়ের অধিকার। নচেৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা এর প্রতিটি জিনিসকেই নিজের হক বলে উল্লেখ করে এ মর্মে জবাব চাইবেন যে, এ হকটি তুমি কেন আদায় করো নি। নবী কারীম (সা) এ কথাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিবৃত করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ বলবেন, হে বান্দাহ্ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি কেন আমাকে আহার করাও নি? আমি উলংগ ছিলাম তুমি কেন আমাকে কাপড় দাও নি? আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি কেন আমাকে পরিচর্যা (ইয়াদত) করো নি? কিন্তু বান্দাহর কাছে এর কোনোই জবাব থাকবেনা। (মুসলিম, আবু হুরাইরা)

বস্তুত আল্লাহ্র কোনো বান্দাহ্ এবং কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য বা প্রয়োজন পূরণ এত বড়ো পুণ্যের কাজ যে, অন্য কোনো নেকিই এর সমকক্ষ হতে পারে না। এর আসল স্পিরিট হচ্ছে এই যে, একজন মুসলমান ভাইকে আরাম দেয়া বা তার হৃদয়কে খুশী করার মতো যে কোনো উপায়ই পাওয়া যাক না কেন, তাতে মোটেই বিলম্ব করা উচিত নয়।

এক ব্যক্তি যতোক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত তাকে, ততোক্ষণ সে আল্লাহ্র সাহায্যের উপযোগী থাকে। রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ عَبْدِهٖ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ ـ

'আল্লাহ্ ততোক্ষণ তার বান্দাহ্র সাহায্য করতে থাকেন, যতোক্ষণ সেই বান্দাহ্ তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে।' (মুসলিম, তিরমিযী ; আবু হুরায়রা রা.)

এ হাদীসেই নবী কারীম (সঃ) সাহায্যের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে তার প্রত্যেকটি পুরস্কার সম্পর্কে বলেনঃ

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُّؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ

كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يَّسْتُرُ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ-

'যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের কোনো দুনিয়াবী অসুবিধা দূর করলো, আল্লাহ্ তার কিয়ামত-দিবসের একটি অসুবিধা দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবী লোককে সুবিধা দান করলো, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সুবিধা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখলো, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।' (মুসলিম ; আবু হুরায়রা রা.)

এ প্রসংগেই অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَيُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

'মুসলমান মুসলমানের ভাই। না সে তার ওপর জুলুম করবে, আর না আপন সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে। যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করলো, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-মুছিবত দূর করে দিবে, আল্লাহ্ তার কিয়ামত-দিবসের অসুবিধা দূর করে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম ; ইবনে উমর রা.)

সাহায্য ও সদাচরণের একটি বিরাট অংশ ধন-মালের ওপর আরোপিত হয়। আল্লাহ্ যাকে এ নিয়ামত দান করেছেন, প্রত্যেক বঞ্চিত ব্যক্তিই তার কাছ থেকে সাহায্য পাবার অধিকারী ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ-

রাসূল (সা) এ জিনিসটিকে অত্যন্ত উচ্চাংগের বর্ণনাভংগীর মাধ্যমে পেশ করেছেন ঃ

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهِ-

'মাখলুক হচ্ছে আল্লাহ্‌র পরিবার বিশেষ, সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর এ ব্যক্তি পরিবারের সংগে সদাচরণ করলো, আল্লাহর কাছে তাঁর মাখলুকের মধ্যে সেই হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয়।' (বায়হাকী)

ক্ষুধার্তকে আহার করানোর ব্যাপারে কুরআন খুব তাকিদ করেছে। প্রাথমিক মক্কী সূরাগুলোতে এর বহু নজীর রয়েছে। রাসূলে কারীম (সঃ) মদীনায় এসে তাঁর প্রথম খুতবায় মুসলমানদেরকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দান করেন এবং বলেন যে, এরপর তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারো। তার ভেতর একটি নির্দেশ ছিলো এই ঃ

وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ 'এবং আহার করাও।'

তিনি আরো বলেন ঃ

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ ـ

'যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খেলো এবং তার নিকটস্থ প্রতিবেশী অনাহারে রইলো, সে মু'মিন নয়।' (বায়হাকী ; ইবনে আব্বাস রা.)

এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর কাছে নিজের নির্দয়তা সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলো। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ

قَالَ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ ـ

'ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে আহার করাও।'
(আহমদ ; আবু হুরায়রা রা.)

ফরিয়াদীর প্রতি সুবিচারও এ সাহায্যেরই একটি শাখাবিশেষ। তাই রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ اَغَاثَ مَلْهُوْ فًا كَتَبَ اللّٰهُ ثَلَاثًا وَّسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَّاحِدَةً فِيْهَا صَلَاحُ اَمْرِهٖ كُلِّهٖ وَاِثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهٗ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

'যে ব্যক্তি কোনো ফরিয়াদীর প্রতি সুবিচার করলো, আল্লাহ্‌ তার জন্যে ৭৩টি পুরস্কার লিপিবদ্ধ করে দেন। এর ভেতর একটি পুরস্কার হচ্ছে তার সমস্ত কাজের

কল্যাণকারিতার নিশ্চয়তা। আর বাকি ৭২টি পুরস্কার কিয়ামাতের দিন তার মর্যাদাকে উন্নত করবে।' (বায়হাকী)

কোনো প্রয়োজনশীল ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করাও সাহায্যের একটি অন্যতম পন্থা। কুরআন ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর সুপারিশের প্রশংসা করে বলেছেঃ

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ـ

'যে ব্যক্তি নেক কাজের সুপারিশ করবে, সাওয়াবে তারও অংশ থাকবে।'
(সূরা নিসা : ৮৫)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কখনো কোনো ব্যক্তি প্রয়োজন নিয়ে এলে তিনি সাহাবীদেরকে বলতেনঃ

قَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجِرُوْا –

'এর জন্যে সুপারিশ করো এবং সাওয়াবে অংশগ্রহণ করো।'

একদা হযরত আবুজার গিফারী (রা) এর সংগে আলোচনা প্রসঙ্গে নবী কারীম (সা) সাহায্যের বিভিন্ন পর্যায় ও পন্থাকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে তোলেন। তিনি (গিফারী) বললেন ঃ 'ঈমানের সংগে আমলের কথা বলুন।' রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আল্লাহ যে রুজী দিয়েছেন, তা থেকে অপরকে দান করবে।' আরজ করলেন ঃ 'হে খোদার রাসূল! সে লোকটি যদি নিজেই গরীব হয়?' বললেন ঃ 'নিজের জবান দ্বারা নেক কাজ করবে।' পুনরায় আরজ করলেন ঃ 'তার জবান যদি অক্ষম হয়?' বললেন ঃ 'দুর্বলের সাহায্য করবে।' আরজ করলেন ঃ 'যদি সে নিজেই দুর্বল হয় এবং সাহায্য করার শক্তি না থাকে?' বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোনো কাজ করতে পারে না তার কাজ করে দিবে।' পুনরায় আরজ করলেন ঃ 'যদি সে নিজেই এমনি অকর্মণ্য হয়?' বললেন ঃ 'লোকদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে।'

এখানে সেই হাদীসটিরও পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক ঃ

'যে ব্যক্তি আমার কোনো উম্মতকে খুশী করার উদ্দেশ্যে তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী প্রয়োজন পূর্ণ করলো, সে আমাকেই খুশী করলো; যে আমাকে খুশী করলো, সে আল্লাহ্কেই খুশী করলো এবং যে আল্লাহ্কে খুশী করলো আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

এ প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) থেকে একটি চমৎকার বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। বর্ণনাটি হচ্ছে এইঃ একদা রাসূল (সা) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে

জিজ্ঞাসা করলোঃ লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে প্রিয় কে? রাসূল (সা) বললেন ঃ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ - أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِىْ عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا وَأَنْ تَمْشِىْ مَعَ أَخٍ فِىْ حَاجَةٍ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنِ اعْتَكَفَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُّمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَاءَهُ اللّٰهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضَاهُ وَمَنْ مَّشٰى مَعَ أَخِيْهِ فِىْ حَاجَةٍ حَتّٰى يَقْضِيَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُوْلُ الْأَقْدَامُ -

‘লোকদের ভেতর আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে প্রিয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মানুষের বেশী উপকার করে; আর আমলের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে অধিকতর পছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, তুমি কোনো মুসলমানের বিপদ মুছিবত দূর করবে। অথবা তার দেনা পরিশোধ করে দেবে অথবা তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করে তাকে খুশী করবে। জেনে রেখো, এই মসজিদে একমাস ই’তেকাফ করার চাইতে কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের খাতিরে তার সংগে চলা আমার কাছে বেশী প্রিয়। যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ সংবরণ করলো অবশ্য সে চাইলে তা পূর্ণ করতেও পারতো—তার দিলকে আল্লাহ্ কিয়ামাতের দিন আপন সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণার্থে তার সংগে চললো এবং তা পূর্ণ করে দিলো, আল্লাহ্ তার পদযুগলকে সেদিন স্থিরতা দান করবেন, যখন তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)।’

২. দুঃখ কষ্টে অংশগ্রহণ

আপন ভাইয়ের সাহায্য ও প্রয়োজন পূরণ এবং তার সংগে সদাচরণ করার ভিত্তি হচ্ছে এই যে, একজনের দুঃখ ব্যথা অপরের দুঃখ ব্যথায় পরিণত হবে। এক ব্যক্তি যদি কষ্ট অনুভব করে তবে অপরেও অতোখানি তীব্রতার সংগেই তা অনুভব করবে। যেমন দেহের একটি অংগ অন্যান্য তাবৎ অংগ-প্রত্যংগের কষ্টে শরীক হয়ে থাকে, তেমনি এক মুসলমান অপর মুসলমানের দুঃখ কষ্টে শরীক থাকবে।

রাসূলে কারীম (সা) কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -

'তোমরা মু'মিনদেরকে পারস্পরিক সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং পারস্পরিক দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিতে এমনি দেখতে পাবে, যেমন একটি দেহ। যদি তার একটি অংগ রোগাক্রান্ত হয়, তবে তার সংগে গোটা দেহ জ্বর ও রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে তাতে অংশ গ্রহণ করে থাকে।' (বুখারী, মুসলিম ; নুমান বিন বশীর রা.)

অনুরূপভাবে একটি বর্ণনায় তিনি এর ব্যাখ্যা দান প্রসংগে বলেছেন যে, সমাজে একজন মু'মিনের অবস্থান হচ্ছে গোটা দেহে মস্তকের সমতুল্য। মাথায় ব্যথা হলে যেমন গোটা দেহ কষ্টানুভব করে, তমনি একজন মু'মিনের কষ্টে সমস্ত মু'মিনই কষ্টানুভব করতে থাকে। রাসূল (সা) এর একটি সরাসরি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ -

'এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্যে ইমারতের মতো হওয়া উচিত এবং তাদের একে অপরের জন্যে এমনি দৃঢ়তা ও শক্তির উৎস হওয়া উচিত, যেমন ইমারতের একখানা ইট অপর ইটের জন্যে হয়ে থাকে।' এরপর রাসূল (সা) এক হাতের আংগুল অন্য হাতের আংগুলের মধ্যে স্থাপন করলেন।
(বুখারী, মুসলিম ; আবু মুসা রা.)

৩. সমালোচনা ও নছিহত

একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, সে তার ভাইয়ের কাজ কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেখলে পরামর্শ দিয়ে শোধরানোর চেষ্টা করবে। এ হচ্ছে একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের

কর্তব্য বিশেষ। অবশ্য এ কর্তব্য পালনটা প্রায়ই অপ্রীতিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ সত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে, এক ব্যক্তির মনে যদি আখিরাতে আসল কামিয়াবী এবং সে কামিয়াবী অর্জনে পারস্পরিক সহায়তা সম্পর্কে পূর্ণ চেতনা বর্তমান থাকে এবং সে এ সম্পর্কেও সজাগ থাকে যে, আখিরাতের জিজ্ঞাসাবাদের চাইতে দুনিয়ার সমালোচনাই শ্রেয়তর, তবে দুনিয়ার জীবনে এ সংশোধনের সুযোগ দানের জন্যে সে আপন ভাইয়ের প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ হবে। উপরন্তু সমালোচক ও জিজ্ঞাসাবাদকারী যদি এ সম্পর্কিত জরুরি শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে এ কাজটি সম্পাদন করেন, তবে এ কৃতজ্ঞতাই আরো সামনে এগিয়ে গিয়ে পারস্পরিক ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতাকে আরো সমৃদ্ধ ও দৃঢ়তর করে তুলবে। এ জন্যে যে, এর ফলে সমালোচক একজন সহৃদয় ব্যক্তি বলে প্রতিভাত হবেন। নবী কারীম (সা) যে হাদীসে সমালোচনার নছিহত করেছেন, তাতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি গোটা জিনিসটাকে স্পষ্ট করেও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيْهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ

‘তোমরা প্রত্যেকেই আপন ভাইয়ের দর্পণ স্বরূপ, সুতরাং কেউ যদি তার ভাইয়ের মধ্যে কোনো খারাপ দেখে তো তা দূর করবে।’ (তিরমিযী ; আবু হুরায়রা রা.)

এ সম্পর্কে আবু দাউদের বর্ণনাটি হচ্ছে এইঃ

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ ضَيْعَتَهُ

أَوْ يَحُوْطُهُ مِنْ وَّرَائِهِ -

‘একজন মু’মিন অপর মু’মিনের পক্ষে আয়না স্বরূপ এবং এক মুমিন হচ্ছে অপর মু’মিনের ভাই, সে তার অধিকারকে তার অনুপস্থিত কালেও সংরক্ষিত রাখে।’

এ দৃষ্টান্তের আলোকে সমালোচনা ও নছিহতের জন্যে নিম্নোক্ত নীতি নির্ধারণ করা যেতে পারে ঃ

১। ছিদ্রান্বেষণ বা দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো উচিত নয়। কেননা আয়না কখনো ছিদ্রান্বেষণ করে না। মানুষ যখন তার সামনে দাঁড়ায়, কেবল তখনই সে তার চেহারা প্রকাশ করে।

২। পেছনে বসে সমালোচনা করা যাবে না। কারণ সামনা-সামনি না হওয়া পর্যন্ত আয়না কারো আকৃতি প্রকাশ করে না।

৩। সমালোচনায় কোন বাড়াবাড়ি হওয়া উচিত নয়। কেননা আয়না কোনরূপ কমবেশী না করেই আসল চেহারাটাকে ফুটিয়ে তোলে।

৪। সমালোচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ এবং কোনোরূপে স্বার্থসিদ্ধি ও দুরভিসন্ধি থেকে মুক্ত হওয়া উচিত, কারণ আয়না যার চেহারা প্রতিবিম্বিত করে, তার প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করে না।

৫। বক্তব্যটুকু দেবার পর তাকে আর মনের মধ্যে লালন করা উচিত নয়, কেননা সামনে থেকে চলে যাবার পর আয়না কারো আকৃতি সংরক্ষিত রাখে না। অন্য কথায় অপরের দোষ গেয়ে বেড়ানো উচিত নয়।

৬। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, এর ভেতর পরম নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও ভালোবাসা ক্রিয়াশীল থাকতে হবে, যাতে করে নিজের সমালোচনা শুনে প্রতিটি লোকের মনে স্বভাবতই যে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সমালোচকের এ মনোভাব উপলব্ধি করা মাত্রই তা বিলীন হয়ে যায়। এজন্যেই হাদীসে مِرْآةُ الْمُسْلِمِ এর সঙ্গে اَخُو الْمُسْلِمِ ও বলা হয়েছে। বস্তুত এক ব্যক্তি যখন তার দোষত্রুটিকে তার পক্ষে ধ্বংসাত্মক বলে অনুভব করতে পারবে এবং সে সঙ্গে নিজেকে তার চাইতে বড় মনে না করে বরং অধিকতর গুনাহ্গার ও অপরাধী বলে বিবেচনা করবে, কেবল তখনই এমনি সহানুভূতি ও সহৃদয়তা পয়দা হতে পারে।

৪. মুলাকাত

ভালোবাসার অন্যতম প্রধান ও বুনিয়াদী দাবী হচ্ছে এই যে মানুষ যাকে ভালবাসবে, তার সংগে বার বার মুলাকাত বা দেখা-সাক্ষাত করবে, তার সাহচর্য গ্রহণ করবে এবং তার কাছে বসে কথাবার্তা বলবে। একথা মানবীয় মনস্তত্বের একজন প্রাথমিক ছাত্রও জানেন যে, এ জিনিসগুলো শুধু প্রেম ভালোবাসার বুনিয়াদী দাবীই নয়, বরং তার বিকাশ বৃদ্ধি এবং পরস্পরের আন্তরিক বন্ধনকে দৃঢ়তর করার পক্ষেও অন্যতম প্রধান কার্যকরী উপায়। প্রেম ভালোবাসা এই দাবী করে যে, মানুষ যখনই সুযোগ পাবে, তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করবে। এমনি মুলাকাতের ফলে পারস্পরিক ভালোবাসা স্ব ভাবতই বৃদ্ধি পায় এবং এভাবে এর এক অসমাপ্য

ধারা শুরু হয়ে যায়। মুলাকাতের বেলায় যদি শরীয়াতের পূর্বোল্লেখিত নীতিসমূহ স্মরণ রাখা হয় এবং সামনের জিনিসগুলোর প্রতিও লক্ষ্য আরোপ করা হয়, তবে দু'জন মুসলমানের দেখা সাক্ষাৎ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের সহায়ক হবে না এবং দুভাইকে অধিকতর নিকটবর্তী করবে না—এটা কিছুতেই হতে পারে না। এজন্যেই আমরা দেখতে পাই যে, নবী কারীম (সা) পারস্পরিক ভালোবাসার ক্ষেত্রে এ জিনিসটিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন, এর জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন, এর বেশুমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে তিনি বলেন ঃ 'সৎ সহচর একাকিত্বের চাইতে উত্তম।' (বায়হাকী, আবুজার কর্তৃক বর্ণিত)

একবার তিনি হযরত আবু জারাইনকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

هَلْ شَعَرْتَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ زَائِرًا اَخِيْهِ شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّهُ وَصَلَ فِيْكَ فَصِلْهُ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُعْمَلَ جَسَدَكَ فِى ذَالِكَ فَافْعَلْ -

'তুমি কি জানো, কোনো মুসলমান যখন তার ভাইয়ের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরোয়, তখন তার পেছনে সত্তর হাজার ফিরেশতা থাকে! তাঁর জন্যে দোয়া করে এবং বলে হে প্রভু, এ লোকটি শুধু তোমার জন্যে মিলিত হতে যাচ্ছে, সুতরাং তুমি একে মিলিত করে দাও। যদি তোমার নিজের শরীর দিয়ে এ কাজটি (মুলাকাত) করা সম্ভবপর হয় তা হলে তা অবশ্যই করো।'
(বায়হাকী ; আবু জুরিয়ান রা.)

একটি হাদীসে রাসূলাল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত চমৎকারভাবে এ মুলাকাতের ওপর আলোকপাত করেছেনঃ

قَالَ اِنَّ رَجُلًا زَارَ اَخًا لَّهٗ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَارْصَدَ اللّٰهُ لَهٗ عَلٰى مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا فَلَمَّا اَتٰى عَلَيْهِ قَالَ : اَيْنَ تُرِيْدُ ؟ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِّىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ - قَالَ هَلْ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا

قَالَ لَا غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهُ فِى اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ -

'এক ব্যক্তি ভিন্ন গাঁয়ে অবস্থিত তার এক ভাইয়ের সঙ্গে মুলাকাত করতে চললো। আল্লাহ্ তায়ালা তার চলার পথে একজন ফিরেশতা নিযুক্ত করলেন। ফিরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কোথায় যাবেন?' সে বললো, 'অমুক গ্রামে আমার ভাইয়ের সংগে মুলাকাত করতে যাচ্ছি।' ফিরেশতা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তার কাছে কি আপনার কিছু পাওনা আছে, যা আদায় করতে যাচ্ছেন?' সে বললো, 'না, আমি শুধু আল্লাহ্র জন্যে তাকে ভালোবাসি; এছাড়া আর কোনো কারণ নেই।' ফিরেশতা বললো, 'আল্লাহ্ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আপনি যেমন তাঁর খাতিরে আপনার বন্ধুকে ভালোবাসেন, তেমনি তিনিও আপনাকে ভালোবাসেন।' (মুসলিম ; আবু হুরায়রা রা.)

এক ব্যক্তি হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রা) এর প্রতি তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করলো এবং বললোঃ 'আমি আল্লাহ্র জন্যে আপনাকে ভালোবাসি।' তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্র (সা) এই সুসংবাদটি শুনালেন ঃ 'আল্লাহ্ তায়ালা বলেন যে, যারা আমার জন্যে একত্রে উপবেশন করে, আমার জন্যে একে অপরের সংগে সাক্ষাৎ করতে যায় এবং আমারই খাতিরে পরস্পরের জন্যে অর্থ ব্যয় করে, তাদের জন্যে আমার ভালোবাসা অনিবার্য।'

আল্লাহ্র জন্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দেখা সাক্ষাতের যে পুরস্কার আখিরাতে রয়েছে, নবী কারীম (সা) তারও সুসংবাদ দিয়েছেন নিম্নোক্তরূপেঃ

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَعُمُدًا مِّنْ يَاقُوْتٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِّنْ زَبَرْجَدٍ لَّهَا اَبْوَابٌ مُّفَتَّحَةٌ مِنْهُ تُضِئُ كَمَا يُضِئُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّىُّ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ يَّسْكُنُهَا قَالَ اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ وَالْمُتَجَالِسُوْنَ فِى اللّٰهِ وَالْمُتَلَاقُوْنَ فِى اللّٰهِ -

'জান্নাতে 'ইয়াকুতে'র স্তম্ভ এবং তার ওপর জবরজদের (এক প্রকার সবুজ মূল্যবান পাথর) বালাখানা রয়েছে। তার দরজাগুলো এমনি চমকদার, যেনো তারকারাজি ঝিকমিক করছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সেখানে কারা থাকবে? তিনি বললেন : যারা আল্লাহ্র জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, একত্রে উপবেশন করে এবং পরস্পরের সাক্ষাত করতে যায়।' (বায়হাকী ; আবু হুরায়রা রা.)

পারস্পরিক ভালোবাসা ও দেখা সাক্ষাতের এতো তাকিদ এবং তার জন্যে এতো বড় পুরস্কারের সুসংবাদ শুধু এজন্যে নয় যে, এটা ভালোবাসার অনিবার্য দাবী অথবা এর দ্বারা ভালোবাসার বিকাশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। বরং এর এও একটি কারণ যে, মানুষকে সঠিক পথে কায়েম রাখার জন্যে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাহচার্যও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ সাহচর্য দেখা সাক্ষাত ও কথাবার্তার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া আরো একটি কারণ এই যে, মানুষ সাধারণভাবে দেখা সাক্ষাত তো করতে থাকেই, কিন্তু সে যদি পুরোপুরি সাওয়াব ও পুরস্কারের প্রত্যাশা নিয়ে আপন ভাইয়ের সংগে মুলাকাত করে এবং এ মুলাকাতের মাঝে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখে, তাহলে তার এ মুলাকাত তার জীবন ও চরিত্র গঠন ও বিকাশ সাধনে এক বিরাট ভূমিকা রাখতে করতে পারে।

উল্লেখিত হাদীস ও প্রমাণগুলো সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে, একজন মু'মিনের সংগে অপর মু'মিনের যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে মূলাকাত ও দেখা সাক্ষাতের চেষ্টা করা উচিত। এতে করে শুধু পারস্পরিক সম্পর্কেরই উন্নতি ঘটবে না, বরং সে সত্তর হাজার ফিরেশতার দোয়ায়ে মাগফিরাত এবং আল্লাহ্র ভালোবাসার হকদার হবে। তা ছাড়া এই মুলাকাতের মাঝে উল্লেখিত হাদীস ও নির্দেশগুলো সামনে রাখলে মন থেকে কখনো 'আল্লাহ্র জন্যে মুলাকাতের অনুভূতি বিনষ্ট হবে না।

৫. রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যা (عِيَادَت)

এ মুলাকাতেরই একটি বিশেষ ধরণ হচ্ছে আপন রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যা করতে যাওয়া। একে এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমান ভাইয়ের বিশেষ কর্তব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। একজন রুগ্ন মানুষ তার দৈহিক ও মনস্তাত্বিক তাকীদেই অপরের সেবা-শুশ্রূষা ও সহানুভূতির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এ সময়ে তার কোনো ভাই এ প্রয়োজন দুটো পূরণ করতে পারলে তা তার হৃদয় মনকে এমন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে, যা পারস্পরিক সম্পর্কের স্থিতি ও বিকাশ বৃদ্ধিতে বিরাট সহায়ক হতে পারে।

সাধারণত পরিচর্যা বলতে বুঝায় রুগ্ন ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ খোঁজ-খবর নেয়াটা হচ্ছে এর ন্যূনতম ধারণা। নতুবা সহানুভূতি প্রকাশ, সান্ত্বনা প্রদান, সেবা শুশ্রুষা করা, ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদিও এর আওতায় এসে যায়। তবু যদি ধরেও নেয়া যায় যে, পরিচর্যা বলতে শুধু রোগীর খোঁজ খবর নেয়াই বুঝায়, তাহলে এ খোঁজ-খবরের জন্যে এতো তাকীদ ও এতো বড়ো পুরস্কার থাকলে সহানুভূতি প্রকাশ, সান্ত্বনা প্রদান, আরোগ্য কামনা ও সেবা-শুশ্রুষার কি মর্যাদা হতে পারে, তা অবশ্যই আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের কর্তব্য সম্পর্কে যে মাশহুর হাদীসগুলো রয়েছে এবং যাতে পাঁচ, ছয় কি সাতটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি হাদীসেই একটি বিশেষ কর্তব্য হিসেবে রোগীর পরিচর্যার তাকীদ করা হয়েছে।

وَاِذَا مَرِضَ فَعِدْهُ -

'যখন সে রোগাক্রান্ত হয়, তার পরিচর্যা করো।' (মুসলিম ; আবু হুরায়রা রা.)

আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) অত্যন্ত চমৎকারভাবে বান্দার কর্তব্য ও অধিকারকে বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি এর ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে বলেন যে, এ কর্তব্য ও অধিকারগুলো মূলত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আরোপিত হয়েছে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ নিজেই ফরিয়াদী হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই রোগীর পরিচর্যা সম্পর্কে নবী কারীম (সঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'হে আদম সন্তান, আমি রুগ্ন হয়ে পড়েছিলাম তুমি পরিচর্যা করোনি।' সে বলবে 'হে আমার প্রভু, আপনি সারা জাহানেরই রব, আমি আপনার পরিচর্যা কিভাবে করতাম।' আল্লাহ্ বলবেনঃ 'তোমার কি জানা ছিলো না যে আমার বান্দাহ্ রুগ্ন হয়ে পড়েছিলো? কিন্তু তুমি তার পরিচর্যা করোনি। যদি করতে তবে আমাকে তার পাশেই পেতে।' একজন রোগীকে পরিচর্যা করলে বান্দাহ্ তার প্রভুরও নৈকট্য লাভ করবে—এর চেয়ে বড়ো সদুপদেশ আর কি হতে পারে!

রোগী পরিচর্যার পুরস্কার সম্পর্কে নবী কারীম (সা) বলেন ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ -

'যখন কোনো মুসলমান তার (রুগ্ন) মুসলিম ভাইয়ের পরিচর্যার জন্যে যায় তবে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের মেওয়া বাছাই করতে থাকে।' (মুসলিম ; ছাওবান রা.)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِىْ وَاِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلَّا صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ -

'যখন কোনো মুসলমান অপর কোনো (রুগ্ন) মুসলমানের পরিচর্যা সকাল বেলায় করে, তার জন্যে সত্তর হাজার ফিরেশতা দোয়া করতে থাকে, এমন কি সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর যদি সন্ধ্যায় পরিচর্যা করে তো সত্তর হাজার ফিরেশতা তার জন্যে দোয়া করে, এমন কি সকাল পর্যন্ত। আর তার জন্যে রয়েছে জান্নাতে মেওয়ার বাগিচা।' (তিরমিযী, আবু দাউদ; আলী রা.)

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَّمْ يَزَلْ يَخُوْضُ الرَّحْمَةَ حَتّٰى يَجْلِسَ وَاِذَا جَلَسَ اِغْتَمَسَ فِيْهَا -

'যে ব্যক্তি রোগীর পরিচর্যা করতে যায়, সে রহমতের দরিয়ায় প্রবেশ করে। আর যখন সে রোগীর কাছে বসে, তখন রহমতের মধ্যে ডুবে যায়।'

রাসূল (সা) আরো বলেছেন-

اِتْمَامُ عِيَادَتِ الْمَرِيْضِ اَنْ يَّضَعَ اَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ اَوْ عَلٰى يَدِهِ فَيَسْاَلُهُ كَيْفَ هُوَ -

'রোগীর পরিচর্যার পূর্ণত্ব হচ্ছে এই যে, পরিচর্যাকারী নিজের হাতকে তার হাত কিংবা কপালে রাখবে এবং সে কেমন আছে, একথা তাকে জিজ্ঞেস করবে।'
(আহমদ, তিরমিযী, আবু ওসমান রা.)

পরিচর্যার কিছু নিয়ম-কানুনও আছে। এর ভেতর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রোগীকে সান্ত্বনা প্রদান, তার আরোগ্য কামনা এবং সেবা শুশ্রূষা করা। রাসূলে কারীম (সা) নিম্নোক্ত ভাষায় এর নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى مَرِيْضٍ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِيْ أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَالِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيُطِيْبُ بِنَفْسِهِ -

'তোমরা যখন কোনো রোগীর কাছে যাও তো তাকে সান্ত্বনা প্রদান করো। এটা যদিও খোদায়ী হুকুমকে রদ করতে পারেনা, কিন্তু রোগীর দিলকে খুশী করে দেয়।'
(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ; আবু সাঈদ রা.)

খোদ রাসূল (সঃ) যখন কোন রুগীর পরিচর্যার জন্যে যেতেন তখন তার কপালে হাত রেখে সান্ত্বনা প্রদান করতেন এবং বলতেন– لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ অতঃপর তার মন কোন্ বিশেষ জিনিসটি চায়, তা জিজ্ঞেস করতেন। সাহাবীদেরকেও তিনি বলতেন যে, তোমরা যখন কোনো রোগীর পরিচর্যা করতে যাবে, তার হাত কিংবা কপালে নিজের হাত রাখবে, তাকে সান্ত্বনা দেবে এবং আরোগ্যের জন্যে দোয়া করবে। (আবু দাউদ, সারাতুন্নবী)

কিন্তু রোগীর কাছে বেশীক্ষণ বসে থাকতে কিংবা শোরগোল করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

৬. আবেগের বহিঃপ্রকাশ

মানুষের অন্তরের মাঝে প্রেমের আবেগ থাকলে তা স্বভাবতই আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে বেড়ায়। আবেগের বগিঃপ্রকাশ থেকে সাধারণত দু'টি ফায়দা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি তার আবেগকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয়, তার আবেগ সর্বদা সতেজ ও উদ্দীপিত থাকে এবং তা ক্রমশ বিকাশ লাভ করতে থাকে। যদি আবেগকে মনের মধ্যে চেপে রাখা হয়, তাহলে তিল-তিল করে তার ওপর মৃত্যুর ছায়া নেমে আসে, তার বিকাশ বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। সজীবতা ও তেজস্বিতা থেকে সে বঞ্চিত হয় এবং এভাবে সে ধীরে ধীরে অধঃপাতের দিকে নেমে যেতে থাকে। আবেগের দ্বিতীয় ফায়দা এই যে, এটা পারস্পরিক সম্পর্ককে অধিকতর দৃঢ় ও স্থিতিশীল করে তোলে। এক ব্যক্তি যখন তার প্রতি তার ভাইয়ের হৃদয়াবেগ সম্পর্কে অবহিত হবে এবং তার জন্যে তার ভাইয়ের মন কতো গভীর প্রেম, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভাবধারা পোষণ করে তা জানতে পারবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই তার হৃদয়ে তা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে। নিজ ভাইয়ের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মুল্য সম্পর্কে তার মনে শ্রদ্ধাবোধ জাগবে। বস্তুত

হৃদয়াবেগের প্রকাশ না ঘটলে উত্তম ভাবধারা পোষণ করা সত্ত্বেও দুইভাইয়ের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার দৃঢ় ও স্থিতিশীল সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে না।

এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমান ভাই যদি ভালোবাসা পোষণ করে তবে ভাইয়ের এ মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হবার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এ জন্যে যে, সে যেন ঐ আবেগের জবাবে নিজের মনের ভেতর সমপরিমাণের আবেগ বিকশিত করতে পারে এবং তার জন্যে ভাইয়ের মনে যে প্রেমানুভূতি রয়েছে, অজ্ঞতাবশত তার পরিপন্থী বা প্রতিকূল কোনো কর্মপন্থা সে গ্রহণ করে না বসে।

এ কারণেই দুই মুসলমান ভাইয়ের পারস্পরিক ভালোবাসার বিকাশ বৃদ্ধির জন্যে বরং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্যে আবেগকে গোপন না রাখা এবং তাকে খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেয়া একান্ত প্রয়োজন। বিপর্যয় সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে এবং নিজের এ ভালবাসাকে সে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু তার ভাই মনের ভেতর ভালোবাসা পোষণ করা সত্ত্বেও যদি নীরব দর্শকের মতো মুখ বন্ধ করে রাখে, তবে সে এ প্রেমের আবেগ প্রকাশের দ্বারা তার ভাইয়ের মনে অবশ্যই সন্দেহ, অবিশ্বাস ও দূরত্বের সৃষ্টি করবে।

অন্তরের গোপন ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির প্রবণতা যদি বাইরে প্রকাশ পায় তাহলে তা বহু পন্থা অবলম্বন করে থাকে। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতিটি কাজ-কর্ম ও পদক্ষেপেই তার ভাইয়ের প্রতি তার আবেগের প্রকাশ ঘটে। এ প্রকাশটা কাজের মাধ্যমেও হয়, জবানের দ্বারাও হয়ে থাকে। বস্তুত সদাচরণ, প্রয়োজন পূরণ, আন্তরিক সমালোচনা ও সংশোধনের প্রয়াস, খাবারের দাওয়াত, প্রসন্ন মুখ, মুচকি হাসি, কোলাকুলি, দুঃখ-কষ্টে অংশ গ্রহণ, পরস্পরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আস্থা স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ প্রবণতাই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এর ভেতর কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি, বাকিগুলো সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে।

এ প্রসংগে দ্বিতীয় বড় কার্যকরী শক্তি হচ্ছে জবান। জবান থেকে নিঃসৃত একটি পীড়াদায়ক কথা যেমন তীরের মতো ক্রিয়াশীল হয় এবং তার ক্ষত মুছে ফেলা কঠিন হয়ে পড়ে, তেমনি একটি মিষ্টি কথা এমনি সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে যে, অন্য মানুষের পক্ষে তা আন্দাজ করাও মুশকিল। এ জন্যেই আমরা দেখেছি যে, জবান সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল সবচেয়ে বেশী সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এর

অপব্যবহার যেমন পারস্পরিক সম্পর্ককে বিপর্যয় ও বিকৃতির নিম্নতম পংকে পৌঁছাতে পারে, তেমনি এর সদ্ব্যবহার করলে এ সম্পর্ককে প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের উচ্চতম পর্যায়েও উন্নীত করতে পারে। এটা খুব কম লোকেই অনুধাবন করে থাকে। সাধারণত জবান থেকে নিঃসৃত কয়েকটি কথার সমষ্টি–যা অন্যের কাছে বন্ধুত্ব ও প্রেমাবেগকে তুলে ধরে মানব হৃদয়কে কতোখানি তুষ্ট করে দেয়। এমন কি, কখনো কখনো বড় রকমের সদারচরণও এর সমকক্ষ হতে পারে না। অথচ এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা একটি ভাল কথা, একটি উদ্দীপনাময় বাক্য এবং একটি আনন্দদায়ক শব্দ উচ্চারণেও কার্পণ্য করে থাকে। এভাবে সে শুধু আপন ভাইয়ের অন্তরকে অপরিসীম আনন্দদানের সৌভাগ্য থেকেই বঞ্চিত হয় না। (যে সম্পর্কে পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের হৃদয়কে খুশী করলো সে আল্লাহ্‌র রাসূলকে খুশী করলো; যে আল্লাহ্‌র রাসূলকে খুশী করলো সে আল্লাহকেই খুশী করলো, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশী করলো, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন।) বরং কখনো কখনো প্রীতিকর কথা না বলে তার ভাইয়ের অন্তরকে কষ্টও দিয়ে থাকে। এমন কি কোনো কোনো সময় সে বে-ফাঁস ও দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত হয় না। অথচ এ সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের মনে কষ্ট দিলো, সে আল্লাহকেই কষ্ট দিলো।'

জবান থেকে আবেগের প্রকাশ বলতে সাধারণত ভালোবাসার অভিব্যক্তি, সালাম, দোয়া, নম্র ও প্রীতিপূর্ণ কথা, সহানুভূতি প্রকাশ, কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা ইত্যাদি জিনিসকে বুঝায়। জবানের এ গুরুত্বকে সামনে রেখেই নবী (সা) সাহাবীদের কাছে হাশর-দিনের নিম্নোক্ত নক্সা পেশ করেন যে, সেদিন মানুষের চারপাশে শুধুই আগুন দাউ-দাউ করতে থাকবে অথবা থাকবে তার আমল ও নেক কাজসমূহ, আর সেদিন আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই সরাসরি হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। অতঃপর তিনি এ মর্মে নির্দেশ দান করেন যে, 'সে ভয়াবহ আগুন থেকে বেঁচে থাকো। তা খেজুরের একটি টুকরো দিয়েই হোক না কেন, আর এটাও সম্ভব না হলে অন্তত ভাল কথা বলো।'

বস্তুত সমস্ত দলীল-প্রমাণ সামনে রেখে এবং সকল দিক বিচার বিবেচনার পর ঐ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কি নির্দেশ দিয়েছেন এবং কেন দিয়েছেন, আমরা সহজেই তা বুঝতে পারি। ভালোবাসার প্রকাশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ –

'যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবে, তখন সে যে তাকে ভালোবাসে, এ খবরটি তাকে পৌঁছানো দরকার।' (তিরমিযী, আবু দাউদ)

এভাবে একদা মহানবী (সা)-এর সামনে দিয়ে একটি লোক যাচ্ছিলো। তখন তাঁর কাছে যারা ছিলো, তাদের ভেতর থেকে একজন বলে উঠলো, 'আমি ঐ লোকটিকে আল্লাহ্‌র জন্যে ভালোবাসি।' নবী কারীম (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

اَعَلَّمْتَهُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَاعْلَمْهُ فَقَامَ اِلَيْهِ فَاَعْلَمَهُ فَقَالَ

اَحَبَّكَ الَّذِىْ اَحْبَبْتَنِىْ لَهُ -

'তুমি কি একথা তার গোচরীভূত করেছো? সে বললো, 'না'। তিনি বললেন ঃ 'যাও তুমি যে তাকে আল্লাহ্‌র জন্যে ভালোবাসো, এ কথা তার গোচরীভূত করো।' অতঃপর সে উঠে দাঁড়ালো এবং তাকে গিয়ে বললো। লোকটি বললো ঃ 'তুমি যার সন্তুষ্টির খাতিরে আমায় ভালোবাসো, তিনি তোমাকে ভালোবাসুন।।'

(বায়হাকী, তিরমিযী ; আনাস রা.)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) একটি ঘটনা বর্ণনা করে বললেন যে, রাসূলে কারীম (সা) হযরত হাসান বিন আলী (রা)-কে চুম্বন করছিলেন। তখন তাঁর কাছে আফরা বিন জালিস (রা) বসেছিলেন। তিনি মহানবী (সা)-কে চুম্বন করতে দেখে বললেন ঃ 'আমার দশটি পুত্র আছে। তাদের কাউকে কখনো আমি চুম্বন করিনি।' রাসূলে কারীম (সা) তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি রহমত থেকে শূন্য, তার প্রতি রহমত করা হয় না।'

مَنْ لَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ -

অন্য এক হাদীসে কথাটিকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্ তোমার দিলকে রহমত থেকে বঞ্চিত করলে আমি কি করবো?' (বুখারী, মুসলিম)

আবেগ প্রকাশের সর্বোত্তম সুযোগ হচ্ছে মুলাকাত। মুলাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এখন আবেগ প্রকাশের জন্যে মুলাকাতটি কি রকম হওয়া উচিত, তাও দেখা যাক।

৭. প্রীতি ও খোশ-মেজাজের সাথে মুলাকাত

পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নে সদ্ব্যবহারের পর মুলাকাতই হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। কিন্তু এর জন্যে শর্ত হচ্ছে এই যে, মূলাকাতের সময় একদিকে যেমন অপ্রিয় ভাষণ, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস ইত্যাদির মাধ্যমে কারো মনোকষ্ট দেয়া যাবে না, অন্যদিকে মুলাকাতের ধরন থেকেই যাতে প্রেমের আবেগটা প্রকাশ পায়, মুলাকাত তেমনিভাবে করতে হবে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফ থেকে আমরা বহু পথনির্দেশ পাই। এর একটি ধরন হচ্ছে এই যে, মুলাকাতের সময় রূঢ়তা, কঠোরতা, তাচ্ছিল্য ও নির্লিপ্ততা ইত্যাদি পীড়াদায়ক ও হৃদয়বিদায়ক আচরণের পরিবর্তে নম্রতা,শিষ্টতা, সৌজন্য ও প্রিয়ভাষণের পরিচয় দিতে হবে। নম্র ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন ঃ

اَلاَ اُخْبِرُ كُمْ بِمَنْ يَّحْرَمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تُحْرَمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلٰى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ -

'আমি তোমাদেরক এমন এক ব্যক্তির কথা বলে দিচ্ছি, যার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম এবং সেও জাহান্নামের ওপর হারাম। এ লোকটি নম্র মেজাজ, নম্র প্রকৃতির ও নম্রভাষী।' (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাসউদ রা.)

আর একটি পন্থা হচ্ছে, হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করা এবং দেখা হওয়া মাত্রই মুচকি হাসি দেয়া। রাসূলে কারীম (সা) এ উভয় জিনিসেরই নসিহত করেছেন। একবার তিনি বলেন ঃ

لاَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْاَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ -

'নেক কাজের ভেতর কোনোটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, যদি তা আপন ভাইয়ের সাথে তোমার হাস্যোজ্জ্বল সাক্ষাৎ করার তূল্যও হয়।' (মুসলিম ; আবু যর রা.)

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, 'আপন ভাইকে দেখা মাত্র মুচকি হাসি দেয়াও একটি সদাকা।'

তাচ্ছিল্য ও নির্লিপ্ততার সঙ্গে নয়, বরং আগ্রহ ও মনোযোগসহকারে সাক্ষাত করতে হবে এবং এ সাক্ষাতকার যে আন্তরিক খুশীর তাকীদেই করা হচ্ছে একথা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে হবে।

নবী করীম (সা) সম্পর্কে সাহাবীগণ বলেন যে, তিনি কারো প্রতি মনোযোগ প্রদান করলে সমগ্র দেহ-মন দিয়েই করতেন। এমনি ধরনের একটি ঘটনা বায়হাকী উদ্বৃত করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে এই ঃ একদা নবী কারীম(সা) মসজিদে এক মজলিসের ভেতর বসেছিলেন। এমনি সময়ে সেখানে একটি লোক এলে নবী কারীম (সা) নড়েচড়ে উঠলেন। লোকটি বললো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যথেষ্ট জায়গা আছে।' তিনি বললেনঃ

إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَاٰهُ اَخُوْهُ اَنْ يَّتَزَحْزَحَ لَهٗ –

'মুসলমানের হক হচ্ছে এই যে, তার ভাই যখন তাকে দেখবে তার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠবে।' (বায়হাকী ; ওয়াইলাহ্ বিন খাত্তাব রা.)

হযরত আয়িশা (রা) বলেন যে, জায়িদ বিন হারিস (রা) যখন মদীনায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্র সঙ্গে মুলাকাত করার জন্যে বাহির থেকে দরজায় খটখট আওয়াজ দেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) চাদর না বেঁধে শুধু টানতে টানতেই বাইরে বেরিয়ে পড়েন। খোদার কসম, আমি না এর আগে আর না এর পরে তাঁকে এমনি অবস্থায় কখনো দেখেছি। তিনি প্রেমের আবেগে জায়েদের গলা জড়িয়ে ধরেন এবং তাকে চুম্বন করেন। অনুরূপভাবে হযরত জা'ফর তাইয়ার (রা) যখন আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে চোখে চুম্বন করেন। হযরত আকরামা (রা) বিন আবু জেহেল তাঁর খেদমতে গিয়ে হাজির হলে তিনি বললেন, 'হিজরতকারী আরোহীকে স্বাগতম।'

৮. সালাম

সালামের মাধ্যমে আবেগ প্রকাশকে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং একেও এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের কর্তব্য ও অধিকারের শামিল করে দেয়া হয়েছে। এতে করে এক দিকে আবেগের প্রকাশ এবং অন্যদিকে আপন ভাইয়ের জন্যে দোয়া তথা শুভাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি ঘটে। নবী কারীম (সা) মদিনায় আসবার পর প্রথম যে খুতবাটি প্রদান করেন, তাতে তিনি চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেন। তার একটি ছিলো এই ঃ

وَاَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

'নিজেদের মধ্যে সালামকে প্রসারিত করো।' এর চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব নিম্নোক্ত হাদীস থেকে প্রকাশ পায় ঃ

لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اِلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

'তোমরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতোক্ষণ না মু'মিন হবে। আর ততোক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছুর সন্ধান দেব না, যা গ্রহণ করে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে? তা হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামকে প্রসারিত করো।' (মুসলিম ; আবু হুরায়রা রা.)

আর একবার মুসলমানের প্রতি মুসলমানের ছয়টি কর্তব্য ও অধিকার নির্দেশিত করে তিনি বলেন ঃ

يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ -

'তার সঙ্গে যখনই মিলিত হবে, তাকে সালাম করবে।' (নিসায়ী ; আবু হুরায়রা রা.)

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে সালামের সূত্রপাতকারী ও অগ্রাধিকার লাভকারীকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

'সালামের সূচনাকারী অহংকার থেকে বেঁচে থাকে।'

তিনি আরো বলেন ঃ

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَءَ بِالسَّلَامِ -

'সালামের সূত্রপাতকারী হচ্ছে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে অধিকতর নিকটবর্তী লোকদের অন্যতম।' (আহমদ, আবু দাউদ ; আবু উসমান রা.)

স্পষ্টত প্রেমের দাবীই হচ্ছে এই যে, মানুষ সামনে এগিয়ে তার ভাইয়ের জন্যে দোয়া করবে এবং এভাবে তার হৃদয়াবেগ প্রকাশ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পথ দিয়ে চলবার কালে সর্বদাই নিজে সালামের সূচনা করতেন। পথে যার সঙ্গেই দেখা হোক—নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সবাইকে তিনি সালাম করতেন। বরং শিশুকে সালাম করার ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে অগ্রসর থাকতেন। সালামের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

اِذَا لَقِيَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْحَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ -

'যখন তোমাদের ভেতর কার কেউ তার ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হবে তখন তাকে সালাম করবে। অতঃপর এ দু'জনের মধ্যে কোনো গাছ, প্রাচীর, পাথর বা অন্য কোনো জিনিস যদি আড়াল সৃষ্টি করে এবং তারপর আবার সাক্ষাত হয়, তখনও সালাম করবে।' (আবু দাউদ ; আবু হুরায়রা রা.)

বিশেষভাবে তিনি পরিবারের লোকদেরকে সালাম করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন এবং হযরত আনাস (রাঃ)-কে বলেছেন ঃ

يَا بُنَىَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ -

'হে বৎস! যখন তুমি নিজ ঘরে প্রবেশ করো সবাইকে সালাম করো। এটা তোমার এবং তোমার পরিবারের লোকদের জন্যে কল্যাণকর হবে।' (তিরমিযী ; আনাস রা.)

সালামের আদান-প্রদান যখন সঠিক অনুভূতি নিয়ে করা হবে, এক ভাই অপর ভাইকে শান্তির জন্যে দোয়া করবে এবং এর মাধ্যমে তার হৃদয়ের ভালোবাসা ও শুভাকাঙ্ক্ষার গভীরতা প্রকাশ পাবে, কেবল তখনই সালামের দ্বারা ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে পারে। নচেৎ প্রচলিত ইসলামের মতো অভ্যাসবশত মুখ থেকে গোটা দুয়েক শব্দ নিঃসৃত হলেই তা দিয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে পারে না, এতে সন্দেহ নেই।

৯. মুছাফাহা

মুলাকাতের সময় আপন ভালোবাসা ও হৃদয়াবেগ প্রকাশের জন্যে রাসূলে কারীম (সা) সালামের পর দ্বিতীয় যে জিনিসটি নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে মুছাফাহা বা করমর্দন। হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছাহাবীদের মধ্যে কি মুছাফাহার প্রচলন ছিলো? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'।

প্রকৃত পক্ষে মুছাফাহা হচ্ছে সালামের সমাপ্তি বা পূর্ণত্ব। অর্থাৎ সালামের গোটা ভাবধারাই এদ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। রাসুলে কারীম (সা) নিজেই এ বর্ণনা করেছেন ঃ

تَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ -

'মুছাফাহার দ্বারা তোমাদের পারস্পরিক সালামের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে।'
(আহমদ, তিরমিযী, আবু উমালাহ্ রা.)

মুছাফাহা সম্পর্কে নবী কারীম (সা) আরো বলেছেন ঃ 'তোমরা মুছাফাহা করতে থাকো, কারণ এরদ্বারা শত্রুতা দূরীভূত হয়।' (تَصَافَحُوْا يَذْهَبُ الْغِلُّ) এছাড়া মুছাফাহার পুরস্কার সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা) নিম্নোক্ত সুসংবাদও দিয়েছেনঃ

مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَصَافِحَانِ اِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَا وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَا اللّٰهَ غُفِرَ لَهُمَا -

'যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয় এবং পরস্পর মুছাফাহা করে তখন তাদের পৃথক হবার পূর্বে তাদের (যাবতীয় দোষত্রুটি) মার্জনা করে দেয়া হয়। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, যখন দুজন মুসলমান মুছাফাহা করে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং তার কাছে মার্জনা চায় তখন তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।'

(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ; বারা বিন গারিব রা.)

১০. উৎকৃষ্ট নামে ডাকা

মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিমাত্রই চান যে, নিজেকে উৎকৃষ্ট নামে সম্বোধন করুক। এটা মানুষের এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। আর যতো প্রীতিপূর্ণ ভাষা ও আবেগময় ভঙ্গীতে তাকে সম্বোধন করা হবে, সম্বোধনকারীর আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় তার দিল ততোই প্রভাবিত হবে। কাজেই এ ব্যাপারে কখনো কার্পণ্য করা উচিত নয়। বরং আপন ভাইয়ের প্রতি নিজের প্রেমের আবেগ যাতে পুরোপুরি প্রকাশ পায়, এমন ভাষা ও ভঙ্গীতেই তাকে ডাকবার চেষ্টা করা উচিত। সাইয়েদ আহমাদ শহীদ (রহ)-এর আন্দোলনে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমপর্যায়ের ও বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদেরকে তাদের নামের সঙ্গে 'ভাই' শব্দ যোগ করে সম্বোধন করতেন, আর ছোটদের শুধু নাম উচ্চারণ করতেন। মোটকথা, নিজের ভালোবাসা যাতে পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় এবং অপরের দিলও খুশী হয়, সম্বোধনটা এমনিতরো হতে হবে। এক ব্যক্তি তার ভাইকে তার অপছন্দনীয় ভাষায় সম্বোধন করবে, একটা প্রীতি ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের ভেতর এর কোনোই অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে প্রিয়ভাষণ সম্পর্কিত সম্পুর্ণ হাদীসই প্রযোজ্য। হযরত উমর (রা) কে 'বন্ধুত্ব কিসের দ্বারা দৃঢ়তর হয়' — এ মর্মে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার কত চমৎকার জবাবই না দিয়েছেন। বলেছেন 'বন্ধুকে উৎকৃষ্ট নামে সম্বোধন করো।'

১১. ব্যক্তিগত ব্যাপারে ঔৎসুক্য

আন্তরিক ভালোবাসার একটি অন্যতম তাকিদ হচ্ছে, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারের ন্যায় আপন ভাইয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ঔৎসুক্য পোষণ করা। ভাইয়ের সঙ্গে যখন মিলিত হবে, তার ব্যক্তিগত অবস্থাদি জিজ্ঞেস করবে এবং সে সম্পর্কে পুরোপুরি ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে। এভাবে এক ভাইয়ের মনে অপরের আন্তরিকতা ও শুভাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে প্রত্যয়ের সৃষ্টি হবে, এক ভাইয়ের হৃদয়াবেগ অন্যের কাছে প্রকাশ পাবে। ফলে এ জিনিসগুলো তাদের সম্পর্ককে অধিকতর স্থিতিশীল করে তুলবে। নবী কারীম (সা) তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে ব্যক্তিতগতভাবে পারস্পরিক পরিচয় লাভের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে এ জিনিসটির প্রতিও আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

إِذَا اٰخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ اِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ وَ مِمَّنْ هُوَفَاِنَّهٗ اَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ -

'এক ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তখন তার কাছ থেকে তার নাম, তার পিতার নাম এবং তার গোত্র-পরিচয় জিজ্ঞেস করে নিবে। কারণ এরদ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসার শিকড় অধিকতর মজবুত হয়।'

(তিরমিযী, ইয়াজিদ বিন নাআমাহ রা.)

নিজের নাম ইত্যাদি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারেরই একটা অংশ। এভাবে আলোচ্য হাদীস আমার পেশকৃত নীতির দিকেই ইঙ্গীত করছে। তাছাড়া 'এদ্বারা প্রেমের শিকড় মজবুত হয়' এ কথাটি এর প্রকৃত তাৎপর্যের ওপরও আলোকপাত করছে।

১২. হাদিয়া

আপন ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশার্থে হাদিয়া দেয়া সম্পর্কের স্থিতিশীলতার জন্যে অতীব ফলপ্রসূ জিনিস। প্রকৃতপক্ষে ভালো কথা বলা, উৎকৃষ্ট নামে ডাকা, ভালোবাসা প্রকাশ করা ইত্যাদি হচ্ছে জবানের হাদিয়া। এগুলোর মাধ্যমে এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি নিজের ভালোবাসা ও হৃদয়াবেগ প্রকাশ করে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস পায়। জবানের এ হাদিয়াগুলো যেমন দিলকে খুশী করে, বিভিন্ন দিলের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে এবং একে অপরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সহায়তা করে, তেমনি বস্তুগত হদিয়াও একের দিলকে অন্যের দিলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং এভাবে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি

পায়। নবী কারীম (সা) হাদিয়ার উপদেশ দান প্রসঙ্গে তার এ ফায়দাও বাতলে দিয়েছেন যে, এরদ্বারা দিলের মলিনতা ধুয়ে সাফ হয়ে যায়। তিনি বলেছেন ঃ

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبْ شَحْنَاؤُكُمْ - (اَوْ كَمَا قَالَ)

'একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও, এরদ্বারা পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং হৃদয়ের দূরত্ব ও শত্রুতা বিলীন হয়ে যাবে।' (মুয়াত্তা মালিক ; আত্বা)

খোদ নবী কারীম (সা) তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে পুনঃ পুনঃ হাদিয়া দিতেন এবং তাঁর সাহাবীগণ তাঁর খেদমতে ও পরস্পর পরস্পরের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন। এ ব্যাপারে আমাদের যে কথাগুলো মনে রাখা দরকার এবং নবী (সা)-এর জীবন থেকে যে পথনির্দেশ পাই, তা হচ্ছে এই ঃ

১। হাদিয়া সর্বদা আপন সামর্থ অনুযায়ী দেয়া উচিত এবং কোনো মূল্যবান বা বিশিষ্ট জিনিস দিতে পারি না বলে এ থেকে বিরত থাকা উচিত নয়; আসলে যে জিনিসটি হৃদয়ে যোগসূত্র রচনা করে, তা হাদিয়ার মূল্য বা মর্যাদা নয়, তা হচ্ছে দাতার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা।

২। হাদিয়া যা কিছুই হোক না কেন, তা সর্বদা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা উচিত।

৩। হাদিয়ার বিনিময়ে সর্বদা হাদিয়া দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। এজন্যে সমপরিমাণের হাদিয়া হতে হবে, এমন কোন কথা নেই, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী দেবে। নবী কারীম (সা)-এর নীতি ছিলো যে, তিনি সর্বদা হাদিয়ার বিনিময় দেবার চেষ্টা করতেন। একবার এক ব্যক্তি বিনিময় নিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

৪। হাদিয়ার মধ্যে রাসূলে কারীম (সা)-এর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস ছিলো খোশবু। আজকের দিনে এ পর্যায়ে বই পত্রকেও রাখা যেতে পারে।

১৩. শোকর-গোজারী

নিজের প্রেমের আবেগের অভিব্যক্তি এবং অপরের ভালোবাসা উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্যে শোকর-গোজারী হচ্ছে একটি উত্তম পন্থা। এক ব্যক্তি যখন উপলব্ধি করেন যে, তার ভাই তার প্রেমের আবেগ ও প্রেমের তাকিদে কৃত কার্যাবলীর গুরুত্ব ও তার মূল্য যথাযথ উপলব্ধি করছে, তখন ভাইয়ের প্রতি তার আন্তরিক ভালোবাসা বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তি যদি উপলব্ধি করে যে, তার আন্তরিকতা ও ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই, তবে তার হৃদয়াবেগ

স্বভাবতই নিষ্প্রভ হতে থাকবে। এজন্যেই এক মুসলমান যখন অন্য মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করতে তার সঙ্গে সদাচরণ করবে, তাকে কোন ভালো কথা বলবে, অথবা তাকে কোনো হাদিয়া দান করবে, তখন তার প্রতি সানন্দচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সে মুসলমান ভাইয়ের অবশ্য কর্তব্য। এভাবে সে যে তার আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মূল্য পুরোপুরি উপলব্ধি করছে, একথা তাকে জানিয়ে দেবে। নবী কারীম (সা) সম্পর্কে সাহাবাগণ বলেন যে, কেউ যখন তাঁর খেদমতে কিছু পেশ করতো তিনি শুকরিয়ার সাথে তা গ্রহণ করতেন এবং কেউ তার কোনো কাজ করে দিলে সেজন্যে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

১৪. একত্রে বসে আহার

আহারাদিতে একে অপরের সঙ্গে অংশগ্রহণ এবং অপরকে নিজ গৃহে খাবারের দাওয়াত দেয়াও আন্তরিকতা ও ভালোবাসা প্রকাশের একটি চমৎকার পন্থা। এর মাধ্যমে শুধু নিঃসংকোচে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায় তাই নয়, বরং এক মুসলমান তার ভাইকে নিজ গৃহে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির মনে এই অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, তার ভাই তার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে। আর এমনি অনুভূতির সৃষ্টি হলে পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চিতরূপে দৃঢ়তর হবে। সাহাবাগণ পরস্পর পরস্পরকে এবং নবী কারীম (সা)-কে প্রায়ই দাওয়াত করতেন। খোদ নবী কারীম (সা)-এর কাছে কোনো খাবার জিনিস থাকলে অথবা কোথাও থেকে কিছু আসলে তিনি গোটা মজলিসকে তাতে শরীক করাতেন। ইতিপূর্বে হাদিয়া প্রসঙ্গে যে জিনিসগুলো বর্ণিত হয়েছে, দাওয়াত ও একত্রে বসে আহার করার ব্যাপারে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। বিশেষ করে দাওয়াতের ব্যাপারে কোনোরূপ সংকোচের প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়, বরং প্রত্যেকেই আপন সামর্থানুযায়ী খাওয়াবেন, তা প্রাত্যহিক খাবারই হোক না কেন। তবে এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে নিমন্ত্রিতের মনে তা শুভ প্রভাব বিস্তার করে বৈ কি। তবে সামনে যাই পেশ করা হোক না কেন, নিমন্ত্রিতের কর্তব্য হচ্ছে তাকে সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতার সাথে কবুল করা। এ ব্যাপারে শেষ কথা হচ্ছে এই যে, হাদিয়ার ন্যায় দাওয়াতেরও বিনিময় করার চেষ্টা করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে একথাও জেনে রাখা দরকার যে, শুরুর দিকে আপন প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনের গৃহে আহার করার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিধাসংকোচ দেখা যেতো। এ ব্যাপারে খোদ কুরআনের সূরা আন নূরে আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তায়ালা এ দ্বিধা-সংকোচের নিরসন করে দিয়েছেন।

১৫. দোয়া

দোয়া এমন একটা জিনিস, যা এক বিশেষ দিক থেকে আমাদের আলোচিত বহুতরো কর্তব্য ও অধিকারকে নিজের ভেতরে আত্মস্থ করে নেয় এবং অন্য দিক দিয়ে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। দোয়ার মাধ্যমে এক মুসলমান তার ভাইয়ের জন্যে আপন প্রভুর কাছে রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে, তার ভালাই ও কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করে এবং তার অবস্থার উন্নতির জন্যে আবেদন জানায়। স্পষ্টত মুসলমানই এ প্রত্যয় পোষণ করে যে, কার্যকারণের আসল চাবিকাঠি আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ। এমতাবস্থায় যখন সে দেখে যে তার ভাই তার জন্যে আপন প্রভুর সামনে প্রার্থনার হাত তুলে ধরেছে, তখন সে যারপরনাই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়।

দোয়া আড়ালে বসে বা সামনা সামনি উভয় প্রকারেই হতে পারে। এর একটি পন্থা হচ্ছে সালাম, যার পূর্ণাঙ্গ রূপের মাধ্যমে মুসলমান তার ভাইয়ের জন্যে শান্তি, রহমত ও বরকত কামনা করে। এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের আর একটি কর্তব্য হচ্ছে এই যে, সে যখন হাঁচি দেবে 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' বলবে তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। আপন মুসলমান ভাইয়ের জানাজার নামাজ পড়াও একটা বিশেষ কর্তব্য এবং এও দোয়ার একটি পন্থা। রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যার (যা ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে) মধ্যেও দোয়া রয়েছে।

দোয়া সামনা সামনি হলে কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞাতসারে হলে তার প্রথম সুফল এই হয় যে, সে তার ভাইয়ের আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসার প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাসী হয়। যেহেতু উভয়েরই অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র রহমত, তাই সে দেখতে পায় যে, তার ভাই তার মঙ্গলের জন্যে শুধু বাস্তব প্রচেষ্টাই চালায় না বরং নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার মতো তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করে। নিজের দুঃখ ক্লেশে অস্থির হয়েও আপন মালিকের সামনে হাত বাড়িয়ে দেয়, নিজের দোষক্রটির মতো তার দোষক্রটি ও গোনাহ খাতার জন্যেও মাগফিরাত কামনা করে এবং নিজের ন্যায় তার জন্যেও খোদার সন্তুষ্টি ও রহমতের প্রত্যাশা করে। সে আরও দেখতে পায় যে, তার ভাই তার প্রতি এতোটা লক্ষ্য রাখে যে, যখন নির্জনে শুধু ভাই এবং তার আল্লাহই বর্তমান থাকে, তখনো ভাই তার কথা স্মরণ রাখেন। এমতাবস্থায় তার অন্তরে তার জন্যে দোয়া প্রার্থনাকারী ভাইয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। এভাবে হৃদয়াবেগ প্রকাশের সমস্ত ফায়দাই দোয়ার মাধ্যমে লাভ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ দোয়া প্রার্থনাকারী যখন চেষ্টা করে অন্যকে নিজের দোয়ার মধ্যে শামিল রাখে, তখন উভয়ের আন্তরিক সম্পর্ক অধিকতর বৃদ্ধি পায় এবং সে সঙ্গে সম্পর্কের ভেতর পবিত্রতারও সঞ্চার হয়।

উপরন্তু রহমত, মাগফিরাত, প্রয়োজন পূরণ ও অসুবিধা দূরীকরণের দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপন ভাইয়ের জন্যে সত্যপথে অবিচল থাকা এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বের জন্যেও দোয়া করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا

"হে আল্লাহ আমাদের অন্তরসমূহকে সংযুক্ত করে দাও, আমাদের পারস্পারিক মনোমালিন্য দূর কর।"

এভাবে অন্তর থেকে মলিনতা, বিদ্বেষ ইত্যাদি দূরীভূত হবার জন্যেও দোয়া করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি তিক্ততা, মনোমালিন্য বা অভিযোগ লালন করা এক মারাত্মক রকমের ব্যাধি। এর নিরাময়ের জন্যে তাই বিনীতভাবে দোয়া করা উচিত।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমাদান কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্যে কোনো হিংসা ও শত্রুতাভাব রেখো না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং করুণাময়।' (সুরা হাশর : ১০)

দোয়ার ভেতরে আপন ভাইয়ের নামোচ্চারণ বা তার স্মরণ করলে তা দ্বারা অধিকতর সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপন ভাইয়ের জন্যে রহমতের দোয়া করা, আল্লাহ্র কাছে তার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা কামনা করা এবং সম্পর্ককে বিকৃতি ও অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করার জন্যে আবেদন জানানো তো এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের কর্তব্যই; কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে নিজের জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা এবং দোয়ার ভেতর শরীক থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করাও পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ 'যখন আপন রুগ্ন ভাইয়ের পরিচর্যার জন্যে যাও তখন তার দ্বারাও নিজের জন্যে দোয়া করিয়ে নাও। কারণ তার দোয়া বেশী কবুল হয়ে থাকে।'

একবার হযরত উমর (রা) হজ্জে রওয়ানা করলে নবী কারীম (সা) তাঁকে কয়েকটি কথা বলেন, কথা কয়টি সম্পর্কে খোদ ওমর (রা)-এর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, 'এটা আমার গোটা জীবনের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস।' সে কথা কয়টি হচ্ছে এই ঃ 'হে আমাদের ভাই, নিজের দোয়ার মধ্যে আমাদেরকে স্মরণ কোরো।'

১৬. সুন্দরভাবে জবাব দেয়া

আপন মুসলমান ভাইয়ের আন্তরিকতা ও ভালোবাসার জবাব তাঁর চেয়েও অধিকতর আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সঙ্গে দেয়ার জন্যে প্রত্যেক মুসলমানেরই চেষ্টা করা উচিত। এ জন্যে যে, কোনো সম্পর্কই একতরফা ভালোবাসার দ্বারা বিকাশ লাভ করতে পারে না। পরন্তু এর দ্বারা অন্য ভাইয়ের মনও এই ভেবে নিশ্চিত থাকে যে, তার ভালোবাসার না অপচয় হচ্ছে আর না তাকে অসমাদর করা হচ্ছে। সালামের জবাবে সালাম দেয়া, হাদিয়ার বিনিময়ে হাদিয়া দেয়া, ভালো কথার জবাবে ভালো কথা বলা এবং এ সবকিছুই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ উল্লেখিত নীতির ওপরই আলোকপাত করে। এ প্রসংগে রাসূলে কারীম (সা) এর নিম্নোক্ত বাণীও স্মরণ রাখা উচিতঃ

'দুইজন প্রেমিকের মধ্যে সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যে তার ভাইয়ের প্রতি অধিক ভালোবাসা পোষণ করে।'

যদি আপন ভাইয়ের ভালোবাসার জবাবে অধিকতর উত্তম জবাব দেয়া সম্ভবপর না হয় তাহলে অন্তত সমপর্যায়ের জবাব দেয়া উচিত এবং সেইসঙ্গে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে তা অন্যের হৃদয়কে প্রভাবিত করবেই।

১৭. আপোষ রফা এবং অভিযোগ খণ্ডন

সম্পর্কের ভিত্তিকে মনে রাখার পর তাতে বন্ধুত্ব ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি এবং বিকৃতি ও অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার উপযোগী উপায় অবলম্বনের ব্যাপারে স্বভাবতই নানারূপ দোষক্রটি ও অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। কখনো কোনো কাজে ভুলক্রটি হবে না, এটা কোনো মানুষের পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। বিশেষত এ সম্পর্ক যেহেতু ইসলামী বিপ্লবের জন্যে গড়ে ওঠে, তাই শয়তানও এ ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর থাকে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে বিকৃত করা ও তাতে ফাটল সৃষ্টির জন্যে সর্বদা ছিদ্রপথ খুঁজতে থাকে।

পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তা সঠিকভাবে সামনে রাখা হলে এবং নিজের জবান ও আমল দ্বারা আপন ভাইকে কোনোরূপ দৈহিক বা মানসিক কষ্ট না দেয়া, ভাইয়ের দ্বীনী ও দুনিয়াবী সাহায্যের জন্যে সম্ভাব্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করা, নিজের আন্তরিকতা ও ভালোবাসাকে পুরোপুরি প্রকাশ করা, অন্যের আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মূল্য উপলব্ধিস্বরূপ অধিকতর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা কিংবা অন্তত সমপর্যায়ের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা ইত্যাকার নীতি অনুসরণ করলে এবং এরই মানদণ্ডে নিজের আচরণকে যাচাই করতে থাকলে এর ভেতর শয়তানের অনুপ্রবেশ খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তারপরেও যদি সম্পর্কের ভেতর বিকৃতি ও খারাবী পরিলক্ষিত হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের সামনে কয়েকটি জিনিস অবশ্যই রাখতে হবে। এ জিনিসগুলো সামনে রাখা হলে বিকৃতি দেখা দিলেও তা সহজেই দূর করা যাবে। সম্পর্কের বিকৃতির সাধারণ ভিত্তি হচ্ছে, এক মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অপর ভাইয়ের মনে অভিযোগ সৃষ্টি। অভিযোগ সৃষ্টির বহু কারণ থাকতে পারে। তবে এ অধ্যায়ে যে জিনিসগুলো আলোচিত হচ্ছে, তা সবগুলো কারণকেই দূরীভূত করে দেয়। প্রতিটি অভিযোগের ভেতরেই একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো মুসলমান তার ভাইয়ের কোনো কথা বা কাজের দ্বারা মনোকষ্ট পেলে তা থেকেই অভিযোগের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি যদি গুরুতর হয় তাহলে এ অভিযোগই সম্পর্কের বিকৃতির জন্যে যথেষ্ট। আর যদি ছোটোখাটো ব্যাপার হয় তবেঅনুরূপ আরো কয়েকটি বিষয় মিলে এক প্রচণ্ড অনুভূতির সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে আলোচিত বিষয়গুলো সবার সামনে রাখা জরুরী।

প্রথমতঃ এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে কোনো অভিযোগের সুযোগই দেবেন না। তার দ্বারা অন্য ভাইয়ের মনে যাতে কোনো কষ্ট না লাগে, এজন্যে তার সর্বদা চেষ্টা করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ আপন ভাইয়ের ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানেরই দরাজদিল হওয়া উচিত। রাসূলে কারীম (সা)-এর উন্নত নৈতিক শিক্ষার প্রতি তার লক্ষ্য রাখা উচিত এবং কারো বিরুদ্ধে যাতে অভিযোগ সৃষ্টি না হয় আর হলেও তা অবিলম্বে অন্তর থেকে দূর করার জন্যে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

তৃতীয়তঃ উক্ত প্রচেষ্টার পরও যদি অভিযোগ সৃষ্টি হয় এবং তাকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে তাকে মনের ভেতর লালন করা উচিত নয়। বিষয়টি ছোটো হোক বা বড়ো, অবিলম্বে তা আপন ভাইয়ের কাছে প্রকাশ করা উচিত। আপন ভাই সম্পর্কে মনের ভেতর অনুমান ও মালিন্য রাখা এবং সে মালিন্যের সাথে তার সঙ্গে

মিলিত হওয়া নিকৃষ্টতম চরিত্রের পরিচায়ক। কাজেই এ ব্যাপারে কোনোরূপ বিলম্ব না করে অন্তরের এ মলিনতা দূর করার জন্যে অনতিবিলম্বে চেষ্টা করা উচিত।

চতুর্থতঃ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে, তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না এবং এজন্যে নাসিকাও কুঞ্চিত করবেন না। বরং যে দরদী ভাই পেছনে বলাবলি করে খেয়ানত করার পরিবর্তে সামনে এসে অভিযোগ পেশ করলো এবং সম্পর্ককে অতীব মূল্যবান জিনিস মনে করে সামান্য অভিযোগেরও নিরসন করতে এগিয়ে এলো এবং সংশোধনের সুযোগ দান করলো তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

পঞ্চমতঃ আপন ভাইয়ের মনে কোনো অভিযোগ রয়েছে, একথা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসংশোধনের চেষ্টা করবে। কারণ, সময় যতো অতিক্রান্ত হয় বিকৃতিও ততোই দৃঢ়মূল হয়। তাছাড়া যতো তাড়াতাড়ি ফেতনার মূলোৎপাটন করা যায়, ততোই মঙ্গল। যদি সত্যি সত্যি তার দ্বারা ক্রটি হয়ে থাকে তাহলে খোলা মনে তার স্বীকৃতি জানাবে এবং সেজন্যে অনুশোচনা প্রকাশ করবে। সে ক্রটির জন্যে কোনো ওজর থাকলে তাও পেশ করবে। আর কোন ক্রটি না হলে বরং কোনো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলে অথবা কোনো যুক্তি সংগত ওজর থাকলে সে ভুল বুঝাবুঝি দূর করবার প্রয়াস পাবে। এ ব্যাপারে ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি একজন মুসলমানের এ কর্তব্য পালনের প্রতি সুন্দরভাবে আলোকপাত করে ঃ

'তুমি যদি কুরবান গাহে আপন নজর পেশ করতে যাও এবং সেখানে গিয়ে তোমার মনে আসে যে,আমার বিরুদ্ধে আমার ভাইয়ের অভিযোগ রয়েছে, তাহলে কুরবান গাহের সামনে তোমার নজর রেখে দাও এবং ফিরে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে আপোষরফা কর; কেবল এরপরই আপন নজর পেশ করতে পারো।'

এখানে অত্যন্ত চমৎকার কথা বলা হয়েছে। তোমার ভাই যদি তোমার প্রতি বিরূপ হয় তাহলে তোমার পক্ষে একজন ভালো লোক হওয়া এবং ভাইয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ককে সম্প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন ব্যাপার। বস্তুতঃ ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য কেবল তখনই পূর্ণ হবে, যখন আমরা আল্লাহ্‌কে খুশী করতে পারবো। তাই নজর পেশ করার আগে ভাইয়ের অভিযোগ দূর করে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা এবং এ ব্যাপারে আদৌ বিলম্ব না করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ এক মুসলমান ভাই ক্রটি স্বীকার করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়াই কর্তব্য, এ ব্যাপারে কোনোরূপ কার্পণ্য করা উচিত নয়। সে কোনো অক্ষমতা পেশ করলে তাকে অক্ষম বলে বিবেচনা করা এবং তার অক্ষমতাটি কবুল করাও কর্তব্য। পরন্তু

সে যদি ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কোনো বক্তব্য পেশ করে তাহলে তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করাও কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি স্মরণ রাখা উচিত ঃ

'যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের কাছে নিজের ত্রুটির জন্যে অক্ষমতা (ওজর) পেশ করলো, অথচ সে তাকে অক্ষম মনে করলো না এবং তার অক্ষমতাও কবুল করলো না, তার এতোটা গুনাহ্ হলো, যতোটা অবৈধ শুল্ক গ্রহণজনিত জুলুমের ফলে একজন শুল্ক গ্রহণকারীর হয়ে থাকে।'

এ নির্দেশগুলো যথাযথ অনুসরণ করতে হলে লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যটা খুব ভালোমতো উপলব্ধি করতে হবে, নিজের অন্তরে ভাই এবং ভাইয়ের প্রেমের আবেগের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে সম্পর্কের বিকৃতি কতো বড় গুনাহ্র ব্যাপার সে সম্পর্কেও পুরোপুরি উপলব্ধি থাকতে হবে। এর প্রথম জিনিসটি প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা এবং বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা থেকে খুব ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। দ্বিতীয় জিনিসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নবী কারীম (সা)-এ সম্পর্কের বিকৃতির ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'এ হচ্ছে একটা মুণ্ডনকারী ক্ষুর, যা গোটা দ্বীন ইসলামকেই পরিষ্কার করে দেয়।' কাজেই যে ব্যক্তি আখিরাতের কামিয়াবীকেই আসল কামিয়াবী বলে বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই নিজের দ্বীনকে যে কোনো মূল্যে সংরক্ষিত রাখবে, আর যে নিজের দ্বীনকে সুরক্ষিত রাখতে ইচ্ছুক হবে, সে আপন সাধ্যানুযায়ী ঐ সম্পর্ককে কখনোই বিকৃত হতে দেবে না। নবী কারীম (সা) পারস্পরিক অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তা যেমন মনোরম তেমনি কঠোরও। তিনি বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثَ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

'আপন ভাইকে অসন্তুষ্টি বশত তিন দিনের বেশী ত্যাগ করা এবং উভয়ের সাক্ষাত হলে পরস্পর বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কোনো মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয়। এই দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি সালামের সূচনা করবে (অর্থাৎ, অসন্তোষ বর্জন করে আপোষের সূত্রপাত করবে) সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।'

(বুখারী, মুসলিম ; আবু আইউব আনসারী রা.)

এ থেকে আপোষ-রফার সূত্রপাতকারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। এ ধরনের দু'জন মুসলমানের সাথে আল্লাহ্র দরবারে কিরূপ আচরণ করা হয়, নবী কারীম (সা) তাও বলেছেন ঃ

تُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّؤمِنٍ اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا اَوْاَرْكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا -

'সপ্তাহের দু'দিন সোম ও বৃহস্পতিবার লোকদের কীর্তি-কলাপ (আল্লাহ্র দরবারে) পেশ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাহকেই ক্ষমা করে দেয়া হয়, কেবল আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া। বলা হয়, তাকে কিছু দিনের জন্যে ছেড়ে দাও, যেনো পরস্পরে আপোষ করে নিতে পারে।'
(মুসলিম ; আবু হুরায়রা রা.)

যে ব্যক্তি তিনদিন পর্যন্ত আপন ভাইকে পরিত্যাগ করে, তার সম্পর্কে রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ -

'আপন ভাইকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করা কোনো মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন থাকলো এবং এই সময়ের মধ্যে মারা গেলো, সে জহান্নামী হবে।' (আহমদ, আবু দাউদ ; আবু হুরায়রা রা.)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفَكِ دَمِهٖ -

'যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে এক বছরের জন্যে ত্যাগ করলো, সে যেনো তার রক্তপাত করলো (অর্থাৎ সে এতোটা গুনাহ্ করলো)।' (আবু দাউদ ;আবু হুরায়রা রা.)

অবশ্য এ ব্যাপারে এমনি অবস্থাও দাঁড়াতে পারে যে, এক পক্ষ আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করার পর সম্পর্কচ্ছেদ করছে কিংবা বিরোধের ক্ষেত্রে সে সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় বিচার-বুদ্ধি ও শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার কোনই গুনাহ্ হবে না। তবে এমনি পরিস্থিতিতেও দারাজদিল হয়ে কাজ করা, নিজের ভাইকে ক্ষমা করে দেয়া এবং সত্যের ওপর থেকেও বিরোধ মিটিয়ে ফেলার সদুপদেশই তাকে দেয়া হয়েছে। একটি হাদীসে নবী কারীম (সা)এ বিরোধ প্রত্যাহারের উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ عَلٰى حَقٍّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ أَعْلَاهَا ـ

'যে ব্যক্তি বিরোধ প্রত্যাহার করলো, তার জন্যে জান্নাতের মাঝখানে একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে উন্নত করে নিলো, তার জন্যে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।' (তিরমিযী ; আনাস রা.)

স্পষ্টত সুন্দরতম চরিত্রের উচ্চতম স্তরই হচ্ছে ক্ষমা বা মার্জনা। এর বিনিময়েই মানুষ জান্নাতের উচ্চতম স্তরে স্থান পাবার যোগ্য হয়।

আপোষ-রফার সঙ্গে সঙ্গে দুইভাইয়ের মধ্যকার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং কোথাও বিকৃতির চিহ্ন দেখলে তাকে সংশোধন করা অন্যান্য মুসলিম ভাই ও সাধারণভাবে মুসিলম সমাজের কর্তব্য। কারণ এ সংশোধনের উপরই পারস্পরিক সম্পর্কের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। আর এ সম্পর্কই হচ্ছে সমাজের প্রাণ ও আত্মা। আল কুরআন নিম্নোক্ত ভাষায় এ সংশোধনের হুকুম দিয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ -

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা করে ফেলে। — (হুজরাত : ১০)

এমন কি, এ ব্যাপারে সীমাতিক্রমকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রাসূলে কারীম (সা) একবার সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলবো মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে যার সওয়াব

নামাজ, রোজা, সাদকার সওয়াবের চাইতেও বেশী?' সাহাবীগণ বললেন ঃ 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন।' তিনি বললেন ঃ

إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ - وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ -

'লোকদের মধ্যকার (সম্পর্কের) সংশোধন করা আর লোকদের মধ্যকার সম্পর্কের বিপর্যয় সৃষ্টি করা হচ্ছে দ্বীনকেই মুণ্ডিয়ে ফেলা।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন (যদিও মিথ্যার ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত কঠোর) ঃ

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا فَيَنْمِى خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا -

'যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করায়, ভালো কথা বলে এবং ভালো কথা পৌঁছিয়ে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়।' (বুখারী, মুসলিম ; উম্মে কুলসুম রা.)

অর্থাৎ এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের কাছে এমনি সৎপ্রবণতা পৌঁছিয়ে দেয়, যা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। অবশ্য এমন মধ্যস্থতা যেখানে সংশোধনের জন্যে প্রয়োজন হবে, সেখানে মিথ্যা কথা বলা এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের ভালোবাসা ও শুভাকাঙ্ক্ষার প্রতি আস্থাবান হতে পারে, এমন ভঙ্গিতে কথা বলাই উচিত।

এ নির্দেশগুলোর আলোকে মুসলমান যদি নিজেও অভিযোগের সুযোগ না দেয় এবং সেই সঙ্গে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে আর সমাজও সচেতন থাকে, তাহলে শয়তানের পক্ষে নাকগলানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

১৮. প্রভুর কাছে তওফিক কামনা

বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক হচ্ছে ঈমানের একটি বুনিয়াদী শর্ত এবং তার অনিবার্য দাবী। নিজের লক্ষ্য যতোটা প্রিয় হবে, এক ভাইয়ের সঙ্গে অন্য ভাইয়ের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কও ততোটাই গভীর হবে। যখন একজনের দুঃখ ক্লেশ অপরের দুঃখ ক্লেশে, একজনের পেরেশানী অপরের পেরেশানীতে এবং একজনের আনন্দ অপরের আনন্দে পরিণত হয়, তখন সম্পর্ক একদিক দিয়ে তার অভীষ্ট মানে উন্নীত হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে যখন রহমত ও শুভাকাঙ্ক্ষায় সমন্বয় ঘটে তখন সবদিক থেকেই সম্পর্ক উচ্চতম স্থান লাভ করে। বস্তুত এমনি সম্পর্কই একটি জামায়াত ও আন্দোলনের ভেতর সাফল্যের নিশ্চয়তা দানকারী জীবন ও কর্মচেতনার সঞ্চার করতে পারে।এ বিরাট নিয়ামত যেখানে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা) নির্দেশিত সকল শর্ত ও প্রক্রিয়া অবলম্বনে অর্জিত হয়, সেখানে আল্লাহ্‌র তাওফিকও এর জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ এই হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কাজেই রাব্বুল আলামীন যাতে এই পবিত্র সম্পর্ককে বিকৃতি ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন এবং এর ভেতর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেন, তার জন্যে বিনীতভাবে তাঁর কাছে মুনাজাত করা উচিত।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমাদান কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্যে কোনো হিংসা ও শত্রুতাভাব রেখো না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং করুণাময়।' (সুরা হাশর : ১০)